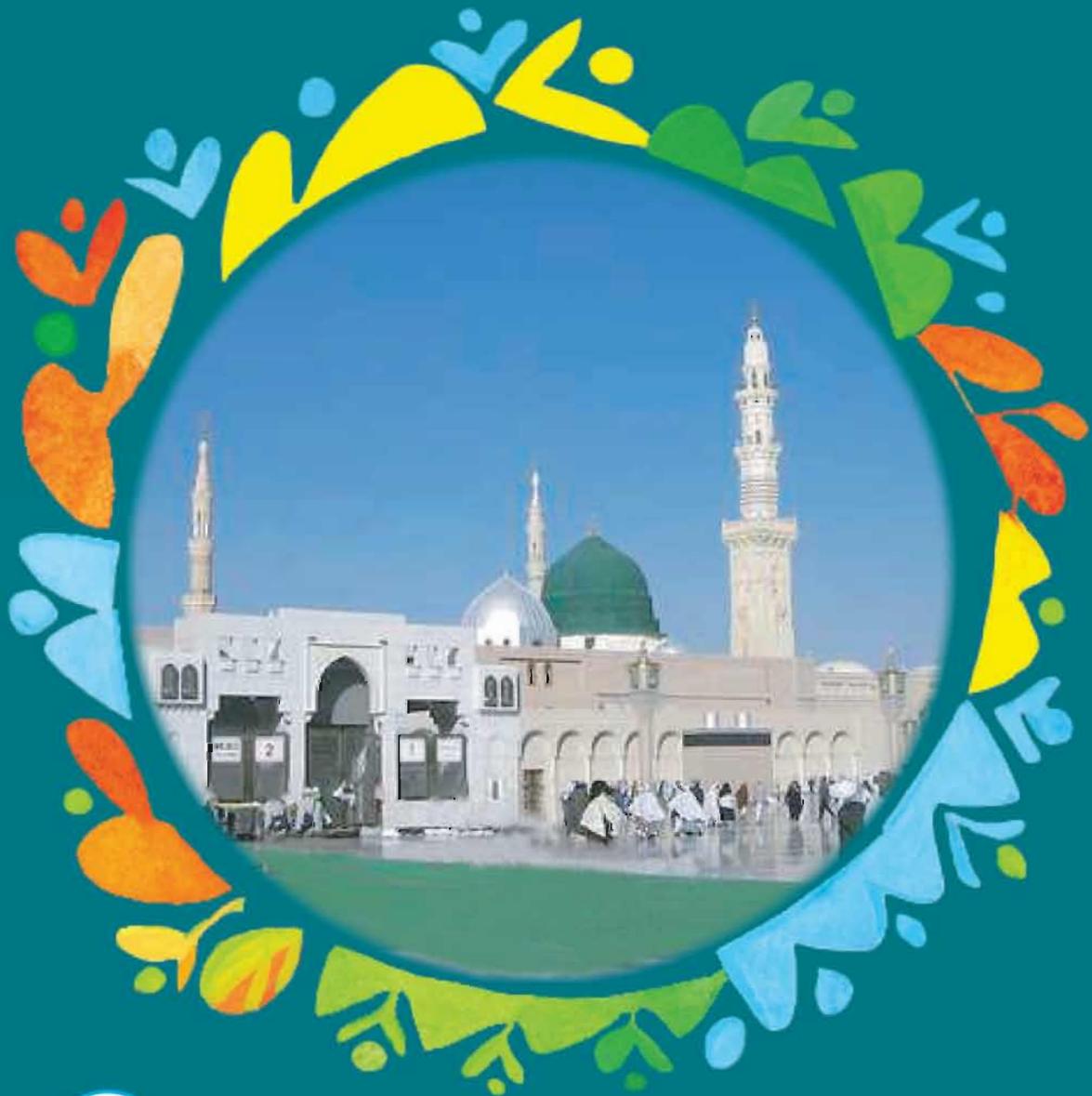


ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা চতুর্থ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীয়ুদ্দীন

অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল মাল্লান মির্যা

মুহাম্মদ কুরবান আলী

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংক্রণ

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

চিত্রাঞ্জন

মোঃ আরিফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স

ফারহানা আক্তার দোলন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অস্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতুহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

শিশুর দৈহিক মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক বিষয়ে সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে যে সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অটল আস্তা ও বিশ্বাস, শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং সব ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম করে গড়ে তোলা। এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজ চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আছাই, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যক্তিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বত্ত্ব প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ শুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চোরম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	পৃষ্ঠা	চতুর্থ অধ্যায়	পৃষ্ঠা
ইমান ও আকাইদ	০১-২০	কুরআন মঙ্গিদ শিক্ষা	৫৫-৭১
মহান আল্লাহর পরিচয়	০১	আরবি বর্ণমালা	৫৬
আল্লাহ মালিক	০৩	হরকত	৫৮
আল্লাহ সর্বশক্তিমান	০৫	তানবীন	৫৯
আল্লাহ শান্তিদাতা	০৭	জয়ম	৬১
কালিমা শাহাদত	০৯	তাশদীদ	৬২
ইমান মুজমাল	১০	মাদ্দ	৬৩
ইমান মুফাস্সাল	১১	তাজবীদ, মাখরাজ, ইদগাম	৬৫
		ইয়হার	৬৬
		সূরা আন নসর	৬৮
		সূরা আল লাহাব	৬৮
		সূরা ইখলাস	৬৯
দ্বিতীয় অধ্যায়		পঞ্চম অধ্যায়	
ইবাদত	২১-৩৯	নবি-রাসূলগণের পরিচয় ও জীবন আদর্শ	৭২-৯৩
তাহারাত	২২	মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ	৭২
গোসল, আযান	২৪	হ্যরত মূসা (আ)	৭৯
ইকামত	২৭	হ্যরত হৃদ (আ)	৮২
সালাত	৩০	হ্যরত সালিহ (আ)	৮৩
জুমুআর সালাত	৩৪	হ্যরত ইসহাক (আ)	৮৩
ঈদের সালাত	৩৫	হ্যরত লূত (আ)	৮৪
		হ্যরত শুয়াইব (আ)	৮৬
		হ্যরত ইলিয়াস (আ)	৮৭
তৃতীয় অধ্যায়		হ্যরত যুলকিফল (আ)	৮৮
আখলাক	৪০-৫৪	হ্যরত যাকারিয়া (আ)	৮৮
আবরা-আম্মাকে সম্মান করা	৪১	হামদ	৯৪
শিক্ষককে সম্মান করা	৪২	নাত	৯৫
বড়দের সম্মান ও ছেটদের মেহ করা	৪৩		
প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার	৪৪		
রোগীর সেবা করা	৪৫		
সত্য কথা বলা	৪৬		
ওয়াদা পালন করা	৪৭		
লোভ না করা	৪৮		
অপচয় না করা	৪৯		
পরিনিষ্ঠা না করা	৫০		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
প্রথম অধ্যায়

إِيمَانُ وَالْعَقَائِدُ - آلِيَّةٌ وَالْعَقَائِدُ

আমরা মুসলিম। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলামের মূল কথাই হলো ইমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে মনেথাপে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অঙ্গে বিশ্বাস করা, মুখে ঝীকর করা এবং সেই অনুসারে আমল করাই হলো প্রকৃত ইমান। যার ইমান আছে তাকে বলে মুশিন।

আকাইদ হলো আকিদা শব্দের বহুবচন। আকিদা অর্থ বিশ্বাস। আর আকাইদ মানে বিশ্বাসমালা। একজন মুসলিমের ইমান ও আকাইদ বিশুদ্ধ হওয়া থেয়োজন।

মহান আল্লাহর পরিচয় (مَعْرِفَةُ اللَّهِ)

আমরা মানুষ। আমরা নিজে নিজে সৃষ্টি হইনি। আমাদের সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করাই তাও নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েনি। এ সুন্দর পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। আমাদের অন্য যা যা থেয়োজন সেসবও তিনিই সৃষ্টি করেছেন।



পৃথিবী

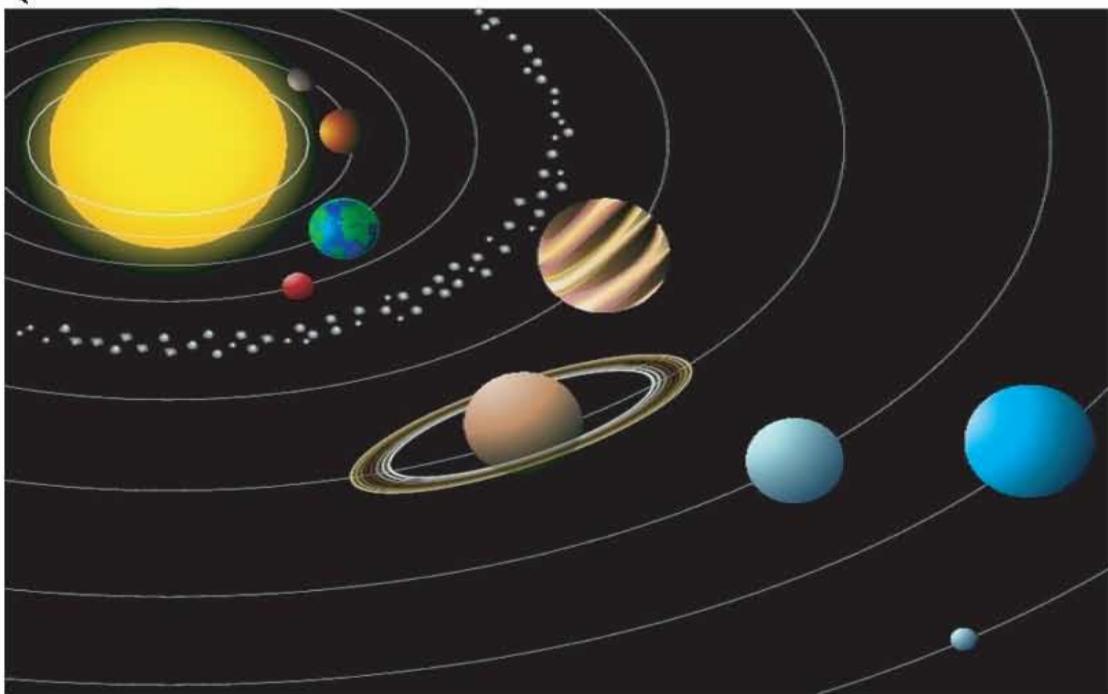
কতো বিশাল এই পৃথিবী। এতে আছে পাহাড়—পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল ও গাছপালা। আছে নানা—রকম ফলফলাদি ও ফুল—ফসল। আরও আছে নানা—রকম পশুপাখি ও জীবজন্তু। এ সবই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি এসব সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। তিনিই আলো-বাতাস, পানি ও মাটি সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখেন, লালন-পালন করেন।

আমরা জাতীয় কবির সাথে কঠ মিলিয়ে বলব—

এই শস্য—শ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালি খানি

খোদা তোমার মেহেরবাণী।

আমাদের মাথার উপর আছে দিগন্তজোড়া বিশাল আকাশ। আকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক একটি নক্ষত্র। আরও আছে অসংখ্য ছায়াপথ। আর নীহারিকাপুঁজি। একসময় এসব কিছুই ছিল না। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি এসব শুধু সৃষ্টিই করেন নি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণও করছেন এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন। তিনি সকল সৃষ্টির মালিক। তিনি সর্বশক্তিমান।



আকাশ ও সৌরজগৎ

মহান আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সম্ভা ও গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো কিছুই নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত।

আমরা জ্ঞান ও বিশ্বাস করব—

ক. আমাদের স্তুতি আল্লাহ।

খ. আসমান—জমিন ও এ দুইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।

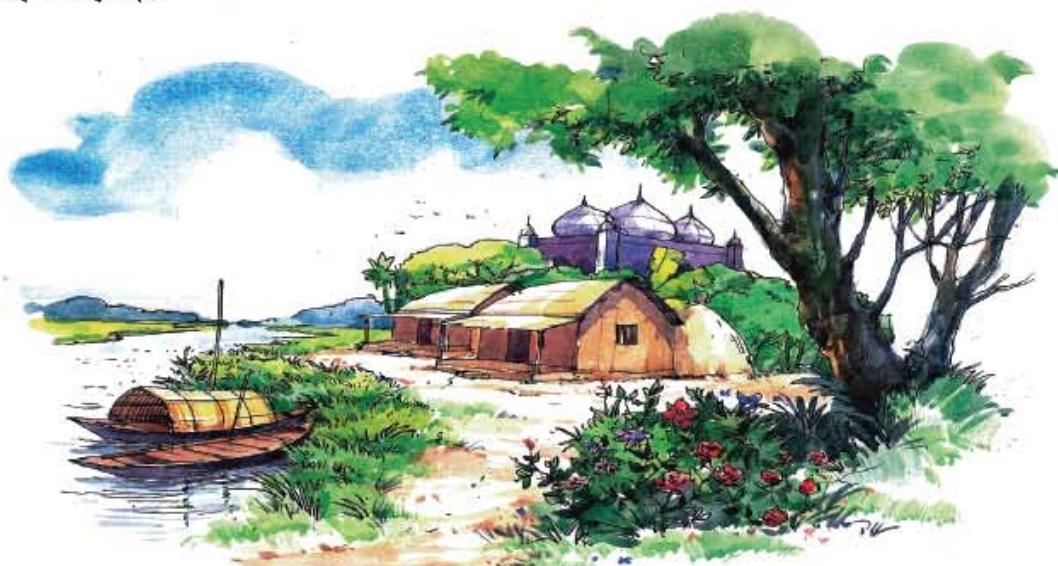
গ. মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং অভূতনীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই।

পরিকল্পিত কাজ: ‘আল্লাহ তায়ালার পরিচয়’—শিক্ষার্থীরা সহকেপে নিজ নিজ খাতায় শিখবে।

আল্লাহ মালিক (الله مالک)

আল্লাহ মালিকুন অর্থ আল্লাহ মালিক। মালিক অর্থ অধিগতি। পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের বসবাসের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কতো বড়, কতো সুন্দর এই পৃথিবী। এতে আছে পাহাড়—পর্বত, খাল—বিল, নদী—নালা, গুপুপাথি, ঝীবঙ্গলু, গাছপালা ও ফুল—ফসল। এসবের মালিক আল্লাহ।

মাটির উপরে যেমন ছোট—বড় অসংখ্য সৃষ্টি আছে, মাটির নিচেও আছে অনেক কিছু। আছে তেল, গ্যাস, কয়লা, সোহা, সোনা, হীরা। আরও কতো কিছু। এসবের মালিকও মহান আল্লাহ।



আল্লাহর স্তুতি প্রাকৃতিক দৃশ্য

আমাদের মাথার উপরে আছে বিশাল আকাশ। আকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও তারা। আরও আছে গ্রহ, উপগ্রহ, ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঁজি। এ বিশাল পৃথিবীর চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক একটি নক্ষত্র। এসব কিছুরও মালিক আল্লাহ তায়ালা।

কুরআন মজিদে আছে, “আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুই মালিক আল্লাহ।” আল্লাহ আমাদেরও মালিক। পরম দয়ালু আল্লাহ এসব কিছুই আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমাদের জন্য হয়। তাঁর ইচ্ছায় আমরা বেঁচে থাকি। আবার তাঁর ইচ্ছায়ই আমাদের মৃত্যু হয়। তিনি আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক। আমাদের ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ। আমাদের সুখ-দুঃখের মালিকও তিনি। তাঁর মালিকানায় কোনো শরিক নেই।



সৌরজগৎ

আমরা কবির কঠে কঠ মিলিয়ে বলব:

কুল মাখলুক আল্লাহ তায়ালা

তোমার দয়ার দান

তুমিই সবার স্বষ্টি পালক

সর্বশক্তিমান।

বাদশাকে করো নিমিয়ে ফকির

ফকিরকে করো ধরার আমীর

জীবিতকে তুমি করিতেছো মৃত

মৃতকে দিতেছো প্রাণ ॥

—কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী

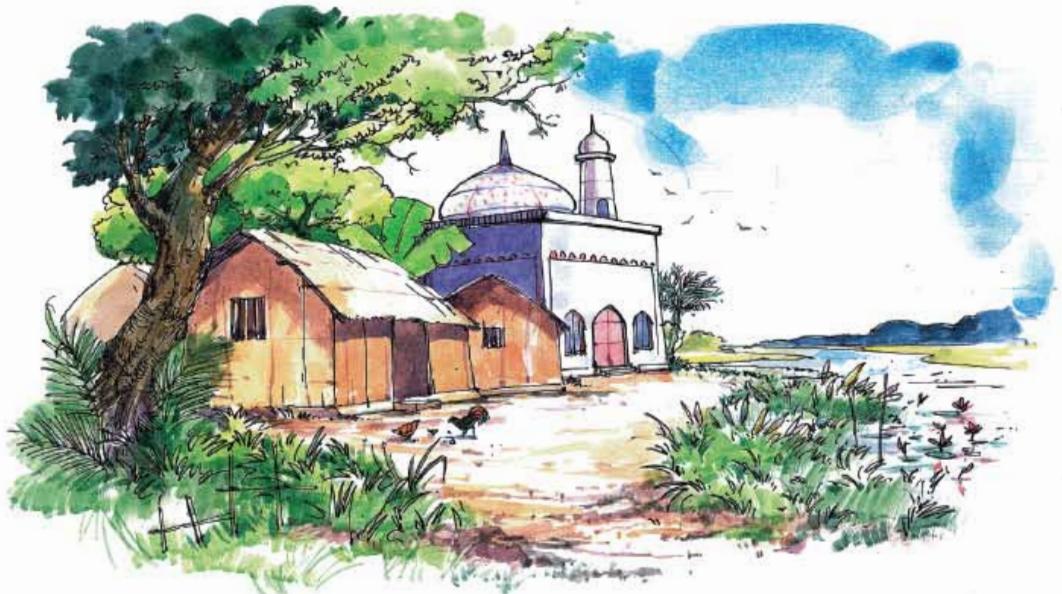
আমরা বিশ্বাস করি, আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ। দুনিয়ার সকল ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ। আমাদের সুখ-দুঃখের মালিক আল্লাহ। আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিকও আল্লাহ। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালো কাজ করব।

পরিকল্পিত কাজ : ‘আল্লাহ সবকিছুর মালিক’। এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা ৫টি বাক্য খাতায় লিখবে।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান (ﷺ)

আল্লাহ কাদীরুন। কাদীর অর্থ সর্বশক্তিমান। তাঁর মতো শক্তি আর কাঁড়ও নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের জন্য এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু এসব তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের মাথার উপর যে বিস্তীর্ণ আকাশ তা সৃষ্টি করেছেন কে? এই আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকাপুঁজি, ছায়াপথ এসবই সৃষ্টি করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। আমরা দেখি প্রতিদিন পূর্বদিক রাঙ্গা করে সূর্য উঠে। দিন হয়, আবার দিন শেষে পঞ্চম আকাশে সূর্য অন্ত যায়। রাত হয়। দিন-রাতের এ পরিবর্তন কে করেন? সর্বশক্তিমান আল্লাহই এ পরিবর্তন করেন। তিনি অসীম শক্তির অধিকারী। তাঁর হুকুমে পৃথিবীর সবকিছু চলে। মহাকাশের সবকিছুই তাঁর হুকুমে চলে।



তাঁর ব্যবস্থাপনায় চন্দ্ৰ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঁজি আপন কক্ষপথে পরিচালিত হয়। কোথাও কোনো অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বা সংঘর্ষ দেখা যায় না। মহান আল্লাহ আলো, বাতাস, আগুন, পানি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব নিয়ন্ত্রণ করেন। মেঘমালা পরিচালনা করেন। বৃক্ষিবৰ্ষণ করে শুকনা মাটিতে প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁর ইচ্ছাতেই মরুভূমির বুক চিরে সুপেয় পানির ঝরনাধারা বেরিয়ে আসে। আমরা মাটিতে বীজ বপন করি, তা হতে চারা গজায়।

আলো, বাতাস, পানি অনেক সময় আমাদের বিপদের কারণ হয়। অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছাসে ঘরবাড়ি, গাছপালা ডুবে যায়। মানুষ ও পশুপাখি ভেসে যায়। ভূমিকঙ্গ, বড়-তুফানে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। বড় বড় গাছপালা উপড়ে যায়। সাজানো গোছানো জনপদ লঞ্চলঞ্চ হয়ে যায়। আমাদের আশ্রয়টুকুও থাকে না। সম্পত্তি ঘটে যাওয়া ‘সিডর’ ও ‘আইলা’-র তাঢ়বের কথা আমরা আজও ভুলতে পারি নি। এ ধরনের দুর্ঘাগে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখব। দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসব। আলো-বাতাস, আগুন-পানি সবকিছুই মহান আল্লাহর শক্তির অধীন।



লঞ্চলঞ্চ জনপদের দৃশ্যাবলি

আল্লাহ শাস্তি দিতে চাইলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। তিনি নমুন্দ, ফিরআউনের মতো পরাক্রমশালী জালিয় শাসকদের ধ্বংস করেছেন। হ্যরত নূহ (আ)-এর অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্রাবল্যে দ্রুবিয়ে মেরেছেন। ছোট ছোট পাথি ধারা আবরাহ বাদশাহুর বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করলে কেউ তাকে মারতে পারে না। অত্যাচারী নমুন্দ হ্যরত ইবরাহীম (আ)কে পুড়িয়ে মারার জন্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আগুন তাকে সর্পণ করতে পারে নি। কারণ আগুন সর্বশক্তিমান আল্লাহর অধীন। মহান আল্লাহ ফিরআউনের হাত থেকে হ্যরত মুসা (আ)-কে রক্ষা করেছিলেন। ইসা (আ)-কে ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স)-কেও কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আমরা মহান আল্লাহকে সর্বশক্তিমান হিসাবে বিশ্বাস করব। তাঁর কাছেই সাহায্য চাইব। কেবলমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রাখব।

আল্লাহ শান্তিদাতা (ﷺ)

আল্লাহু সালামুন। সালাম অর্থ শান্তি। আল্লাহু সালামুন অর্থ আল্লাহ শান্তিদাতা। আমাদের মন যখন তালো থাকে, তখন শান্তি লাগে। শরীর তালো থাকলে মনে শান্তি থাকে।

যখন আমাদের মন খারাপ হয় তখন শান্তি লাগে না। শরীর খারাপ হলেও মনে শান্তি থাকে না। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ আমাদের ঝোগমুক্ত করেন। আমরা সুস্থ হই। শান্তি পাই।

আমাদের পরিবারে আছেন আবু-আমা, তাইবোন। আছেন দাদা-দাদি। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। আমাদের শান্তি থাকে না। আমরা তাঁদের সেবা করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি। তিনি আমাদের বিপদমুক্ত করেন। আমরা শান্তি পাই।

অনেক সময় আমাদের বইথাতা, কলম-পেসিল হারিয়ে যায় তখন আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। শান্তি থাকে না। আবার যখন তা খুঁজে পাই, তখন শান্তি পাই। আমরা যখন বস্তু ও সহপাঠীদের সাথে মিলেমিলে থাকি, তখন তালো লাগে। বস্তু ও সহপাঠীদের সাথে কখনো কখনো বাগড়া হয়। মন খারাপ হয়। তখন শান্তি লাগে না। আমরা তাড়াতাড়ি বাগড়া মিটিয়ে ফেলব, তা হলে শান্তি লাগবে।

রাসুল (স) বলেছেন, ‘সেই ব্যক্তিই সত্যিকার মুসলমান যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।’ রাসুল (স) সবসময় শান্তির জন্য কাজ করতেন। শান্তির জন্য অমুসলিমদের সাথেও সন্ধি করেছেন। একে অপরের সাথে দেখা হলে আমরা সালাম দেই। শান্তি কামনা করি। বলি ‘আসসালামু আলাইকুম’। অর্থ: আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সালামের জবাবে বলি ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’। অর্থ: আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। সালাম বিনিময় একটি সুন্দর নিয়ম। এতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।



কুশল বিনিময় করছে

প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেই শান্তি পাওয়া যায় না। অনেক আগে কারুন নামে এক ব্যক্তি ছিল। তার ধনসম্পদ ছিল প্রচুর। কিন্তু তৃষ্ণি ছিল না, শান্তি ছিল না। সে আরও সম্পদ লাভের জন্য অস্থির ছিল। সে আল্লাহর শোকর করত না। গরিবের হক আদায় করত না। যাকাত দিত না। আল্লাহর হুকুমে সে তার ধনসম্পদসহ ধ্বংস হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা যাকে শান্তি দেন সেই শান্তি পায়। কুঁড়েঘরে থাকলেও শান্তি পায়। অভাব-অন্টনেও শান্তিতে থাকে। আল্লাহ শান্তি দিলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না।

অত্যাচারী শাসক নমরুদ নিজেকে উপাস্য দাবি করেছিল। হয়রত ইবরাহীম (আ) তা মানতে পারলেন না। শান্তি দেওয়ার জন্য নমরুদ তাকে ঝুলন্ত আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তায়ালা আগুনকে বললেন, “হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা হও, শান্তিদায়ক হও!” আগুন হয়রত ইবরাহীম(আ) কে স্পর্শও করতে পারল না।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই শান্তিদাতা। যারা আল্লাহর হৃকূম মেনে চলে তিনি তাদের শান্তি দেন। দুনিয়াতে শান্তি দেন। আখিরাতেও শান্তি দিবেন। তার একটি গুণবাচক নাম “সালাম”। শান্তিদাতা।

আমরা আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা বলে বিশ্বাস করব। তার কাছেই শান্তি চাইব। সবার সাথে শান্তিতে বাস করব। শান্তির পক্ষে কাজ করব।

কালিমা শাহাদত تَعْمِلَةً شَهَادَةً

কালিমাতু শাহাদাতিন। কালিমা অর্থ বাক্য। শাহাদত অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া। কালিমা শাহাদত মানে সাক্ষ্য দেওয়ার বাক্য। এই কালিমা দ্বারা তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেই। এ দ্বারা আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মাবুদ হিসেবে স্বীকার করে নেই। হয়রত মুহাম্মদ (স) কে আল্লাহর বাস্তা ও রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দেই। তাওহিদ ও রিসালাতের উপর ইমান আনি। এটি ইসলামের মূল বিষয়। কালিমা শাহাদত হলো:

আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইলাহাতু	أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ওয়াহ্দাতু লা শারীকালাতু ওয়া আশ্হাদু	وَحْدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ
আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু	أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

কালিমা শাহাদতে দুটি অংশ আছে :

প্রথম অংশ: আশ্হাদু আল লা ইলাহা ইলাহাতু ওয়াহ্দাতু লা শারীকালাতু

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই।

এই প্রথম অংশ দ্বারা আমরা আমাদের স্বক্তা, পালনকারী, রিজিকদাতা, পরম দয়ালু, একমাত্র আল্লাহকে মাবুদ হিসেবে স্বীকার করে নিই। আর সাক্ষ্য দেই— আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়।

ওয়াহ্দাতু দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালার একত্বাদের স্বীকারেন্তি করি। আর ‘লা শারীকালাতু’ দ্বারা শিরককে বাতিল বলে ঘোষণা দেই।

কারণ শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। একজন মুমিন কোনো রকম শিরকে লিপ্ত হতে পারে না। আমরা জানি আল্লাহর কোনো শরিক নেই।

দ্বিতীয় অংশ : ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলু

অর্থ : “আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিচয়ই মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বাস্তা ও রাসুল।”

এই দ্বিতীয় অংশ দ্বারা সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ (স) যেমন আল্লাহর বাস্তা তেমনি তিনি আল্লাহর রাসুল।

আমরা আল্লাহকে চিনতাম না। আল্লাহ সম্পর্কে জানতাম না। কোন কাজে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন তাও জানতাম না। মুহাম্মদ (স) আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন। তাঁর বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহর ইবাদত করার নিয়ম শিখিয়েছেন। তিনি নিজে আল্লাহর বিধান পালন করে আমাদের তা হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর পথে চলব। রাসুল (স)-এর দেখানো পথে চলব। তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাস হলো ইমানের মূলকর্ত্তা।

জাতীয় কবির সঙ্গে কঠ মিলিয়ে বলব :

তুমি কতই দিলে রতন, ভাই বেরাদার পুত্র স্বজন
কৃধা পেলে অন্ন জোগাও, মানি চাই না মানি
খোদা তোমার মেহেরবাণী ॥

খোদা তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বাস্তায় ॥
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে, তরিয়ে নিতে রোজ হাশরে
পথ না ভুলি তাইতো দিলে পাক কুরআনের বাণী
খোদা তোমার মেহেরবাণী ॥

ইমান মুজমাল (إيمان مُجمل)

আমান্তু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্মাহাই	أَمْنَتْ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْبَابِهِ
ওয়া সিফাতিহী ওয়া কুবিলভু জামী'আ	وَ صِفَاتِهِ وَ قَبِيلُ جَمِيعٍ
আহকামিহী ওয়া আরকানিহী	أَحْكَامِهِ وَ أَرْكَانِهِ

অর্থ : আমি ইমান আনলাম আল্লাহর উপর ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তাঁর সব নাম ও গুণাবলিসহ। আর মেনে নিলাম তাঁর সব হুকুম—আহকাম ও বিধি—বিধান। ইমান অর্থ বিশ্বাস। আর মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত। ইমান মুজমাল মানে সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে বিশ্বাস ও শীকার করাকে বলে ইমান মুজমাল। ইমান মুজমাল দ্বারা সংক্ষিপ্ত কথায় ইমানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

আমাদের মাঝে মহান আল্লাহ। তিনি এক, অবিভীয়, অভূলনীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর আছে অনেক সুন্দর শুনবাচক নাম। আল্লাহর সন্তায় যেমন বিশ্বাস করতে হয় তেমনি তাঁর সিফাত বা গুণাবলিতেও বিশ্বাস করতে হয়। তাঁর সন্তার সাথে কানও তুলনা হয় না। তেমনি তাঁর গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই।”

একজন মুসলিমকে আল্লাহ তায়ালার একক সন্তায় বিশ্বাস করতে হয়। তাঁর গুণাবলিতে বিশ্বাস করতে হয়। তারপর আল্লাহর আহকাম ও আরকান বা বিধি—বিধান গ্রহণ করতে হয়। তাঁর আদেশ—নিষেধ মেনে চলতে হয়। আমাদের জন্য যা কল্যাণকর, যা ভালো তিনি তা গ্রহণ করতে বলেছেন। আর যা অকল্যাণকর, যা মন্দ তা বর্জন করতে বলেছেন। এই গ্রহণ ও বর্জন মিলেই হলো ইমান। ইমান মুজমাল খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর বিষয়বস্তু ব্যাপক। এর তাৎপর্য গভীর।

আমরা আল্লাহ তায়ালার সন্তায় ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করব। মহান আল্লাহর বিধি—বিধান ও আদেশ—নিষেধ মেনে নেব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ইমানে মুজমালের অর্থ সুন্দর করে থাতায় শিখবে।

ইমান মুফাসসাল (إيمانٌ مُفصَّلٌ)

আমান্তু বিল্লাহি ওয়া আল্লাহ ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী	أَمْنَتْ بِاللَّهِ وَمَلِئَتْهُ وَكُثِّبَهُ
ওয়া সুলিহী ওয়া ইয়াওমিল আখিলি ওয়া লকাদরি	وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ
খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তাআলা	خَيْرٍ وَشَرٍّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
ওয়াল বাংসি বাংদাল মাউত।	وَالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ : আমি ইমান আনলাম আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলগণের উপর। আরও ইমান আনলাম শেষ দিবসে ও তকদিরের ভালোমন্দে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে।

ইমান অর্থ বিশ্বাস। আর মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত। ইমান মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত বিশ্বাস। আমরা মুমিন। ইসলামের কর্তকগুলো মূল বিষয়ের উপর আমাদের ইমান আনতে হয়। আমরা এর আগে যে বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্ত কথায় স্বীকার করেছি, এখন সে বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে জানব। বিস্তারিতভাবে স্বীকার করব। সে জন্য একে বলা হয় ইমান মুফাসসাল।

ইমান মুফাসসালে আমরা সাতটি বিষয়ের উপর ইমান আনি। বিষয়গুলো হলো :

১. আল্লাহ	২. ফেরেশতা	৩. কিতাব
৪. রাসূলগণ	৫. শেষ দিবস	৬. তকদির
৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান		

১। ইমানের প্রথম বিষয় : আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস

ইমানের প্রথম কথাই হলো আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাঁর সভায় এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর গুণাবলিতেও অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তিনি অনাদি, অনন্ত। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। যখন কোনো কিছুই ছিল না তখন ছিলেন তিনি। আবার একদিন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তিনিই থাকবেন। মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শোনেন ও দেখেন। আসমান জমিনের সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। তিনি সকল সৃষ্টির পালনকর্তা। তিনি পরম দয়ালু। তিনিই সবকিছুর মালিক। আমরা ভালো কাজ করলে তিনি খুশি হন। মন্দ কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ভালো কাজ করব।

২। ইমানের দ্বিতীয় বিষয় : মালাইকা বা ফেরেশতাগণে বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নূরের তৈরি। নূর মানে আলো। তাঁরা আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। তাঁরা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন না। তাঁদের পানাহারের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর জিকিরই তাঁদের জীবিকা। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাঁদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা প্রসিদ্ধ।

ক. হ্যরত জিবরাইল (আ) : তিনি নবি-রাসূলগণের কাছে আল্লাহর ওহি নিয়ে আসতেন। ওহি মানে আল্লাহর বাণী।

খ. হ্যরত মিকাইল (আ) : তিনি জীবের জীবিকা বট্টন ও মেঘবৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত।

গ. হ্যরত আয়রাইল (আ) : তিনি আল্লাহর হুকুমে জীবের জান কবজ করেন।

ঘ. হ্যরত ইসরাফিল (আ) : তিনি শিঙাপা হাতে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় আছেন।
তিনি প্রথম ফুঁ দেবেন, তাতে সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁ দেবেন তখন সবকিছু জীবন ফিরে পাবে।

একদল ফেরেশতা আছেন, যারা মানুষের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব রাখেন। তাদের বলে কিরামান কাতিবিন। মানে সম্মানিত লেখকগণ। মুনকার-নকির নামে আরও ফেরেশতা আছেন। তারা কবরে প্রশু করবেন। প্রশু করবেন- আল্লাহ, রাসূল ও দীন সম্বন্ধে। আল্লাহর অনুগত বাস্তারা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

৩। ইমানের তৃতীয় বিষয় : আসমানি কিতাবে বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলের কাছে ওহি পাঠিয়েছেন। ওহি হলো আল্লাহর বাণী। আল্লাহর বাণীসমূহের সমষ্টিকে বলে আসমানি কিতাব। আসমানি কিতাবে আছে মানুষের জন্য হিদায়াত। মুক্তির কথা।

আসমানি কিতাব হলো ১০৪ খানা। ৪ খানা বড়। আর ১০০ খানা ছেট। ছেট কিতাবকে সহীফা বলে। সহীফা মানে পুষ্টিকা।

৪ খানা বড় কিতাব হলো :

১. তাওরাত : হ্যরত মুসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

২. যাবুর : হ্যরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৩. ইনজিল : হ্যরত ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪. কুরআন মজিদ : হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

কুরআন মজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এতে আছে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষের সব সমস্যার সমাধান, ভালো হওয়ার শিক্ষা। আমরা সকল কিতাবে বিশ্বাস করব। আর কুরআন মজিদের শিক্ষা মেনে চলব।

৪। ইমানের চতুর্থ বিষয় : নবি-রাসূলে বিশ্বাস

আমরা আগেই জেনেছি মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা ওহি পাঠ্যযোগেন। ওহি আসত নবি-রাসূলগণের কাছে। নবি-রাসূলগণ মানুষের শিক্ষক। তাঁরা আদর্শ শিক্ষক। তাঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থ মানবদরদি। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। তাঁকে খুশি করার পথ দেখাতেন। কিতাবে বিশ্বাস করা যেমন ইমানের অঙ্গ, নবি-রাসূলে বিশ্বাস করাও তেমনি ইমানের অঙ্গ।

প্রথম নবি হলেন হ্যরত আদম (আ)। আর শেষ নবি হলেন হ্যরত মুহাম্মদ (স)। এই দুজনের মাঝে অনেক নবি-রাসূল এসেছেন। আল্লাহ বলেন “এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে আমি কোনো নবি পাঠাইনি।”

কুরআন মজিদে ২৫ জন নবি-রাসূলের নাম উল্লেখ আছে। যেমন হ্যরত আদম (আ), হ্যরত ইদরীস (আ), হ্যরত নূহ (আ), হ্যরত ইবরাহীম (আ), হ্যরত ইসমাইল (আ), হ্যরত ইসহাক (আ), হ্যরত ইয়াকুব (আ), হ্যরত ইউসুফ (আ), হ্যরত হুদ (আ), হ্যরত সালিহ (আ), হ্যরত লূত (আ), হ্যরত শুআইব (আ), হ্যরত আইয়ুব (আ), হ্যরত জাকারিয়া (আ), হ্যরত দাউদ (আ), হ্যরত সুলাইমান (আ), হ্যরত মূসা (আ), হ্যরত ঝিসা (আ), হ্যরত মুহাম্মদ (স)। আমরা সকল নবি-রাসূলগণে বিশ্বাস করব। সম্মান করব। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শ মেনে চলব।

৫। ইমানের পঞ্চম বিষয় : শেষ দিবসে বিশ্বাস

আমরা এই দুনিয়ায় চিরদিন বেঁচে থাকি না। এ জীবন চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। আমাদের যেমন জন্ম আছে, তেমনি মৃত্যুও আছে। সকল প্রাণীরই মৃত্যু আছে। যার জীবন আছে তার মৃত্যু আছে। আমাদের সুন্দর পৃথিবীও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আমাদের মৃত্যুর পরের জীবনকে বলে আখিরাত। আখিরাত মানে পরকাল। মৃত্যুর পরেই এ জীবনের শুরু হয়। কবর, কিয়ামত, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম-এসবই আখিরাতের জীবনের অন্তর্ভুক্ত। আখিরাতের জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। সে জীবন অনন্ত কালের। আল্লাহ বলেন, “এ দুনিয়ার জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।”

ইমানের অন্যান্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস যেমন জরুরি, আখিরাত বা শেষ দিবসে বিশ্বাসও তেমনি জরুরি। দুনিয়ায় যে যেমন কাজ করবে আখিরাতে তেমনি ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে আখিরাতে পুরস্কার পাবে। আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। শেষ দিবস বা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি তার কাজকর্মে সতর্ক হয়। পুরস্কারের আশায় ভালো কাজ করে। আর শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। এতে তার নেতৃত্ব চারিত্র উন্নত হয়।

কবি যথার্থেই বলেছেন,

দুনিয়াটা আখিরাতের
খামার বাড়ি ভাই
ভবের হাটের ক্ষেতখামারে
ফসল ফলান চাই ॥
এই ফসলের নেইকো জুড়ি
এক কণা তার হয় না চুরি
হিসাব লেখেন দুই মুহূরী
সদা সর্বদাই ॥
অচিন দেশের যাত্রী সবাই
টারমিনালে ক্ষণিকের ঠাই
কখন যে হায় ঘণ্টা বাজে
ঘড়ির সময় হলে ॥

—কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী

৬। ইমানের ষষ্ঠ বিষয় : তকদিরে বিশ্বাস

তকদির মানে ভাগ্য। আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তায়ালা। আমাদের জীবনে যা ঘটে, যা হয় সবই হয় আল্লাহর নির্ধারিত হুকুমকে বলে তকদির। আমাদের ভাগ্যে কী আছে, আমরা তা জানি না। আমরা চেষ্টা করব, কাজ করে যাব। আর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করব। সফল হলে শোকর করব। বিফল হলে সবুর করব, তকদির বলে মেনে নিব। তকদিরে বিশ্বাস মানুষকে অলস করে না।

আশায় উজ্জীবিত করে।

৭। ইমানের সপ্তম বিষয় : মৃত্যুর পর পুনরু�ানে বিশ্বাস

মৃত্যুই আমাদের শেষ কথা নয়। ইহকালে আমরা যেসব কাজ করি তার জবাবদিহি করতে হবে পরকালে। সকলকে আবার জীবিত করে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে। সেখানে হিসাব-নিকাশ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে বিচার করা হবে। বিচারক হবেন মহান আল্লাহ। ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে জালাত দেওয়া হবে। জালাত হলো পরম সুখের স্থান। যারা পাপ করবে, খারাপ কাজ করবে তাদের শাস্তির জন্য নিষ্কেপ করা হবে জাহানামে। জাহানাম হলো চরম দুঃখ-কষ্ট ও ভীষণ শাস্তির স্থান।

পুনরুখানে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। পুরস্কারের আশায় সৎকর্মশীল করে তোলে। আর শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এতে নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়। আমরা—

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মাঝুদ বলে বিশ্বাস করব।

আল্লাহর ফেরেশতাগণে বিশ্বাস করব।

আল্লাহর রাসূলগণকে বিশ্বাস করব।

শেষ দিবসে বিশ্বাস করব।

তকদিরে বিশ্বাস করব।

মৃত্যুর পর পুনরুখানে বিশ্বাস করব।

আখিরাতের পুরস্কারের আশায় ভালো কাজ করব।

আখিরাতের শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব।

আমাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করব।

পরিকল্পিত কাজ:

- শিক্ষার্থীরা ইমান মুফাস্সালের অর্থ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।
- শিক্ষার্থীরা চারজন প্রধান ফেরেশতার নাম ও তাঁদের কাজ খাতায় লিখবে।
- শিক্ষার্থীরা দশজন নবি-রাসূলের নাম খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক.বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১। ইমান অর্থ কী?

- | | |
|-----------------|------------|
| ক. সত্য কথা বলা | খ. বিশ্বাস |
| গ. গচ্ছিত রাখা | ঘ. শৃঙ্খলা |

২। আমাদের স্বর্ক্ষটা কে?

- | | |
|-----------|-------------------|
| ক. মাতা | খ. পিতা |
| গ. আল্লাহ | ঘ. পিতামাতা উভয়ই |

৩। আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক কে?

- | | |
|-----------|---------------|
| ক. আল্লাহ | খ. আযরাইল (আ) |
| গ. নবিগণ | ঘ. রাসূলগণ |

৪। কাদীর অর্থ কী?

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ক. অধিপতি | খ. শান্তি দাতা |
| গ. সর্বশক্তিমান | ঘ. সর্বত্র বিরাজমান |

৫। সালাম শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. দয়া | খ. শান্তি |
| গ. সৃষ্টি | ঘ. ক্ষমা |

৬। শাহাদত অর্থ কী?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক. দীক্ষা দেওয়া | খ. সাক্ষ্য দেওয়া |
| গ. পরীক্ষা দেওয়া | ঘ. দান করা |

৭। ইমান মুজমাল অর্থ কী?

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ক. সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস | খ. আন্তরিক বিশ্বাস |
| গ. বিস্তারিত বিশ্বাস | ঘ. মৌখিক বিশ্বাস |

৮। ইমান মুফাসসালে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে?

- | | |
|-----------|----------|
| ক. তিনটি | খ. চারটি |
| গ. পাঁচটি | ঘ. সাতটি |

৯। ওহি নিয়ে আসতেন কোন ফেরেশতা?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. আয়রাইল (আ) | খ. মিকাইল (আ) |
| গ. ইসরাফিল (আ) | ঘ. জিবরাইল (আ) |

১০। আসমানি কিতাব কতো খানা?

- | | |
|-------------|-------------|
| ক. ৪ খানা | খ. ১০০ খানা |
| গ. ১০৪ খানা | ঘ. ১১০ খানা |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১) যার ইমান আছে তাকে বলে ————— |
- ২) আল্লাহু সালামুন অর্থ আল্লাহ ————— |
- ৩) পরস্পরে দেখা হলে আমরা ————— দেই |
- ৪) মুহাম্মদ (স) আল্লাহর ————— ও রাসুল |
- ৫) তকদির মানে ————— |

গ. রেখা টেনে অর্থ মেলাও :

- | | |
|-----------|--------------|
| ১) মালিক | বাক্য |
| ২) কাদীর | শান্তি |
| ৩) সালাম | অধিপতি |
| ৪) কালিমা | সর্বশক্তিমান |

ঘ. রেখা টেনে সঠিক উত্তর মেলাও :

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| ১) আয়রাইল (আ) | ওহি আনতেন |
| ২) জিবরাইল (আ) | মেঘবৃষ্টি ও রিজিকের দায়িত্বে |
| ৩) ইসরাফিল (আ) | জীবের জান কবজ করেন |
| ৪) মিকাইল (আ) | শিঙ্গা ফুঁ দেবেন |

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১) আল্লাহ তায়ালার পাঁচটি গুণের নাম লেখ।
- ২) ইমান মুফাসসালে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে?
- ৩) চারজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতার নাম লেখ।
- ৪) চারখানা বড় কিতাবের নাম লেখ।
- ৫) দশজন নবি-রাসুলের নাম লেখ।
- ৬) আসমানি কিতাব কতো খানা?
- ৭) ছেট কিতাবকে কী বলে?
- ৮) সর্বশেষ নবি কে?
- ৯) সর্বশেষ আসমানি কিতাব কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

- ১) সংক্ষেপে আল্লাহর পরিচয় দাও।
- ২) আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি গুণের নাম লেখ।
- ৩) ‘আল্লাহ সর্বশক্তিমান’ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।
- ৪) ‘আল্লাহ শান্তিদাতা’ বাক্যটি বুঝিয়ে লেখ।
- ৫) কালিমা শাহাদত অর্থসহ বাংলায় লেখ।
- ৬) ইমান মুজমাল অর্থসহ বাংলায় লেখ।

- ৭) ইমান মুফাসসালে উল্লিখিত বিষয়গুলোর নাম জেখ।
- ৮) আল্লাহর উপর বিশ্বাস কথাটি বুঝিয়ে জেখ।
- ৯) প্রসিদ্ধ ফেরেশতাদের নাম ও তাদের কাজ বর্ণনা কর।
- ১০) আসমানি কিতাব কাকে বলে? সহক্ষেপে সর্বশেষ আসমানি কিতাবের বর্ণনা দাও।

পরিকল্পিত কাজ

ক. এই শব্দগুলো থাতায় জেখ।

يَا أَللّٰهُ	يَا مَالِكُ
يَا سَلَامٌ	يَا قَدْرِيْرُ

খ. প্রকৃতির একটি ছবি আঁকো।

ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟ

ଇବାଦତ (عِبَادَة)

ଇବାଦତ ଅର୍ଥ ଗୋଲାମି କରା, ଯାଲିକେର କଥାମତୋ ଚଳା । ଆଜ୍ଞାହ ତାମାଳ ଓ ତୀର ରାସ୍ତା (ସ)–ଏଇ କଥାମତୋ କାହିଁ କରାକେ ଇବାଦତ ବଲେ । ଇବାଦତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକ । ସେମନ, ସାଲାହ ଆଦାଯି କରା, କୁରାଅନ ମହିଦ ତିଳାଉତ୍ତାତ କରା, ରୋଗୀର ଦେବା କରା, କଥା ବଳାର ସମୟ ସନ୍ତ୍ୟ କଥା ବଳା ସବ କିମ୍ବାଇ ଇବାଦତ ।

ଇବାଦତର ପରିଚୟ

ଆଜ୍ଞାହ ତାମାଳ କୁରାଅନ ମହିଦେ ବଲେନ, “ଆମି ସୂଚି କରେଛି ଜିଲ ଏବଂ ମାନୁଷକେ ଏଜପ୍ୟ ଯେ, ତାରା ଶୁଦ୍ଧ ଆମାରଇ ଇବାଦତ କରବେ ।”

ଏଇ ଅର୍ଥ ହଲୋ :

1. ଆମରା କେବଳ ଆଜ୍ଞାହ ତାମାଳର ଗୋଲାମି କରିବ, ଅନ୍ୟ କାରଣେ ନନ୍ଦି ।
2. ଆମରା କେବଳ ଆଜ୍ଞାହ ତାମାଳର ଆଦେଶମତୋ ଚଲିବ, ଅନ୍ୟ କାରଣେ ନନ୍ଦି ।
3. କେବଳମାତ୍ର ତୀରଇ ସାମନେ ଯାଥା ନତ କରିବ, ଅନ୍ୟ କାରଣେ ନନ୍ଦି ।
4. କେବଳମାତ୍ର ତୀରକେଇ ତ୍ୱର କରିବ, ଅନ୍ୟ କାରଣେ ନନ୍ଦି ।
5. କେବଳମାତ୍ର ତୀର କାହେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଇବ, ଅନ୍ୟ କାରଣେ କାହେ ନନ୍ଦି ।

ଏହି ପାଇଁଟି ଜିନିସକେ ଆଜ୍ଞାହ ତାମାଳ ବୁଝିଯେହେନ ଇବାଦତ ଶବ୍ଦ ଦାନା । କୁରାଅନ ମହିଦେର ବିଭିନ୍ନ ଆମାତ ହତେ ଇବାଦତ ଶବ୍ଦର ଏବୁଗ ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚରା ଯାଏ । ତାଇ ଅର୍ଥ ବୁଝେ ଇବାଦତ କରା ଉଚିତ । ଆମାଦେର ପିଇ ନବି (ସ) ଏବଂ ତୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ନବିର ଶିକ୍ଷାର ସାରକଥା ହଲୋ, “ଆଜ୍ଞାହ ଛାଡ଼ା ଆର କାରଣ ଇବାଦତ କରୋ ନା ।” ଆମରା ସାଲାହର ପ୍ରତି ରାକାନାତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫାତିହା ଗଡ଼ି; ତଥାନ ଏକଥାଗୁଲୋରଇ ଘୋଷଣା କରେ ଥାକି ।

ଇଯାକ ନَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ଅର୍ଥ : ଆମରା ଶୁଦ୍ଧ ତୋମାରଇ ଇବାଦତ କରି । ଆମରା ଶୁଦ୍ଧ ତୋମାରଇ ନିକଟ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর বিভিন্ন ইবাদত করজ করেছেন। বেষন সালাত, সাওয়, যাকাত ও হজ।

দলীয় কাজ : দলে বসে প্রশ়িল আলাপ-আলোচনা করে ইবাদতের একটি তালিকা তৈরি করে যার্কার দিয়ে পোন্টার পেশারে শিখবে।

ভাষ্যাত - تَهْجِير

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যারা পাক-পবিত্র থাকে আল্লাহ তামের ভালোবাসেন।”

মহানবি (স) বলেন, “পবিত্রতা ইবাদের অঙ্গ।”

পাক-পবিত্র থাকাকেই ভাষ্যাত বলে। ভাষ্যাত অর্থ পবিত্রতা। খুু করা, পৌসল করা ইত্যাদি। যারা পাকসাফ থাকে, পরিষ্কার পোশাক পড়ে, তাদেরকে সবাই ভালোবাসে। সবাই তাদের আদর করে। পাকসাফ থাকলে দেহমন ভালো থাকে। দেখাপড়ার মন বসে। আল্লাহ খুশি হন।

ওয়ু - وُضُوءٌ

কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা সালাত আদায়ের আগে ওয়ু করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাকসাফ ও পবিত্র থাকার অনেক নিয়ম আছে। ওয়ু তার মধ্যে একটি উচ্চম নিয়ম। সালাতের আগে ওয়ু করা ফরজ। ওয়ু ছাড়া সালাত আদার হয় না।

ওয়ুর ফরজ

ওয়ুর ফরজ চারটি। যথা :

১. মুখমণ্ডল ধোয়া।
২. কনুইসহ উভয় হাত ধোয়া।
৩. চার ভাগের এক ভাগ মাথা মাসাহ করা।
৪. গিরাসহ উভয় পা ধোয়া।

পরিবর্ণিত কাজ : ওয়ুর ফরজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

ওয়ুর সুন্নত

ওয়ুর সুন্নত ১১টি। যথা:

১. নিয়ত করা,
২. বিসমিল্লাহ বলে ওয়ু আরস্ত করা,
৩. দাঁত মাজা,
৪. কজি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধোয়া,
৫. তিনবার কুলি করা,
৬. পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করা,
৭. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া,
৮. কান মাসাহ করা,
৯. হাত-পা ধোয়ার সময় ডান হাত ও ডান পা আগে ধোয়া,
১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা,
১১. ওয়ুর কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে পর পর করা।

আবো-আম্মা, বড় ভাইবোন, শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম সাহেব ভালোভাবে ওয়ু করেন।

আমরা তাঁদের ওয়ু দেখে ভালোভাবে ওয়ু করা শিখব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষক প্রথমে ওয়ু করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা ওয়ু করবে। শিক্ষক দেখবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দেবেন।

ওয়ু নষ্ট হওয়ার কারণ

নানা কারণে ওয়ু নষ্ট হয়। এগুলোর প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। যেসব কারণে ওয়ু নষ্ট হয় তা হলো :

১. পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে।
২. মুখ ভরে বমি করলে।
৩. কোনো কিছু ঠেস দিয়ে বা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে।
৪. অঙ্গান হলে।
৫. রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে শরীর থেকে গড়িয়ে পড়লে।
৬. সালাতের মধ্যে উচ্চস্থরে হেসে ফেললে।

ওয়ু করা ফরজ। ওয়ু ছাড়া সালাত আদায় হয় না। ওয়ু সম্পর্কে আমরা সাবধান থাকব।

ওয়ু নষ্ট হলে ওয়ু করে নেব।

পরিকল্পিত কাজ : ওয়ু নষ্ট হওয়ার কারণগুলো লিখবে।

গোসল (غسل)

সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য পাকসাফ ধাকার প্রয়োজন। কিন্তু নানা কাজে নানাভাবে শরীর ময়লা হয়, অপবিত্র হয়। তাই অবশ্যি লাগে। এই ময়লা ও অপবিত্রতা দূর করার উপায় হলো গোসল করা। পানি দিয়ে সারা শরীর খোয়াকে গোসল বলে।

গোসল করলে গোয়ের ঘাম দূর হয়। দুর্গম্য দূর হয়। দেহমন পরিচ্ছ হয়। মন ভালো থাকে। কাজে উৎসাহ আসে।

গোসলের নিয়ম

আমরা গোসলের পূর্বতে দুই হাত খুয়ে নেব। পড়গড়াসহ কূলি করে মুখ পরিষ্কার করব। পানি দিয়ে নাক সাফ করব। পত্রে সারা শরীর ভালো করে তিনবার খুরে কেলব। এভাবে গোসল করব।

গোসলের ফরজ

গোসলের ফরজ তিনটি। যথা:

- ১) পড়গড়াসহ কূলি করা,
- ২) পানি দিয়ে ভালোভাবে নাক সাফ করা।
- ৩) পানি দিয়ে সারা শরীর খোয়া।

খেয়াল রাখতে হবে সারা শরীরের কোনো অংশ থেন শুকনা না থাকে। নিয়মিত গোসল করলে শরীর ভালো থাকে। গোসল করা আজ্ঞাহ তামালার দুর্কুম। এটাও একটা ইবাদত।

পরিষ্কারিত কাজ : গোসলের ফরজ কাজগুলোর ভালিকা তৈরি করবে।

আয়ান (انتداب)

সালাত জামাআতের সাথে আদায় করতে হয়। মহানবি (স) জামাআতে সালাত আদায় করতে ভালিদ দিয়েছেন। জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য কীভাবে ডাকতে হয় কেউ তা জানত না। মহানবি (স) সাহাবিদের নিয়ে একদিন পরামর্শ কসলেন, আলোচনা চলল। কেউ বললেন, সালাতের সময় হলে ঘণ্টা বাজানো হোক। কেউ বললেন, শিঙায় ঝুঁ দিয়ে ভাঙ্কা হোক। কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক। আব্দও অনেকেই অনেক কথা বললেন। মহানবি (স) কোনোটাই পছন্দ করলেন না।

গভীর রাত। সাহাবি হ্যরত আবদুল্লাহ গভীর ঘুমে মগ্ন। স্বপ্ন দেখেন, একজন ফেরেশতা তাঁকে আয়ানের বাক্যগুলো শুনাচ্ছেন। তোরে তিনি ঐ বাক্যগুলো মহানবি (স)-কে শুনালেন। আশ্চর্যের কথা, হ্যরত উমর (রা)ও একই স্বপ্ন দেখেন। বাক্যগুলো মহানবি (স)-এর খুব পছন্দ হলো। তিনি বললেন, ‘এটা মহান আল্লাহরই নির্দেশ।’

মহানবি (স) হ্যরত বিলাল (রা)-কে আয়ান দিতে বললেন। হ্যরত বিলালের কঠে ধ্বনিত হলো প্রথম আয়ান। হ্যরত বিলাল হলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন।

আয়ানের বাক্যগুলো হলো:

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،

আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

হাইইয়া আলাস সালাহ, হাইইয়া আলাস সালাহ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.

হাইইয়া আলাল ফালাহ, হাইইয়া আলাল ফালাহ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাঝুদ নেই। (দুইবার)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল। (দুইবার)

সালাত আদায়ের জন্য এসো, সালাত আদায়ের জন্য এসো।

কল্যাণ ও মঙ্গালের জন্য এসো, কল্যাণ ও মঙ্গালের জন্য এসো।

আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ ছাড়া কোনো মারুদ নেই।

ফজরের আবানে হাইইয়া আলাল ফালাহ-এর পর যুম ভাঙ্গনো ডাক দেয়া হয়। বলতে হয়:

আসসালাতু খাইরুম মিলান নাউম أَصْلُوْةُ خَيْرٍ مِّنَ النَّوْمِ

আসসালাতু খাইরুম মিলান নাউম أَصْلُوْةُ خَيْرٍ مِّنَ النَّوْمِ

অর্থ : যুম থেকে সালাত উত্তম, যুম থেকে সালাত উত্তম।

আবানের এই মর্মসঙ্গী ডাক শুনে কোনো মুমিনব্যক্তি বসে থাকতে পারে না। থক্ক মালিকের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সামনে মাধা নত না করে সে কিছুতেই শান্তি পায় না।

আবানের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন :

বাজল কিরে তোরের শানাই

নিদমহলা আঁধার পুরে ।

শুনাই আবান গগনতলে

অতীত রাতের মিনার চূড়ে ।

কবি কামকোবাদ বলেন:

কে খই শোনাল মোরে আবানের ধ্বনি

মর্মে মর্মে সেই সূর

বাজিল কী সুমধুর

আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী ।

একটি কবিতা : শিক্ষার্থীরা আবানের বাক্যগুলো বাল্লায় ঘার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে।

আবানের শেষে এই দোয়া পড়তে হবে :

أَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْوَةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدٌ إِنَّ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَخْمُودًا إِنَّ الَّذِي وَعَدَهُ. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِيْعَادَ.

আল্লাতুন্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াসসালাতিল কাইমাতি আতি মুহাম্মাদানিশ
ওয়াসীলাতা ওয়ালকাবীলাতা ওয়াক্তারাজাতার রাফিয়াতা ওয়াবজাসহু মাকামাম
মাহমুদানিশ্যায়ী ওয়া আদতাহু। ইন্নাকা লা ভুখলিফুল মীয়াদ।

মুস্যাক্ষিন প্রতিদিন গীচবার আযান দেন। রেডিও-টেলিভিশনে আযান থচার করা হয়। আয়রা তা মনোবোগ দিয়ে শুনব। আয়রা আযান শুনে সালাতের জন্য তৈরি হব। সময়মতো সালাত আদায় করব।

ইকামত (إِقَامَةٌ)

আযান হলো সালাতের আহ্বান। আর ইকামত হলো জামাত শুরুর ঘোষণা। ইকামতের সাথে সাথে জামাত শুরু হয়। ইকামতে আযানের বাক্যগুলোই বলতে হয়। শুধু হাইয়া আলাল ফালাহ বলার পর—

كَبَدِ كَامَاتِسِ سَالَاهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
كَبَدِ كَامَاتِسِ سَالَاهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

দুইবার বলতে হয়। এর অর্থ সালাত শুরু হলো।

তাশাহুদ (تَشْهِيدٌ)

সালাতে দুই রাকআতের পর এবং শেষ বৈঠকে একটা দোয়া পড়তে হয়। এটিকে তাশাহুদ বলে। দোয়াটি হলো :

الْتَّحْيَاتُ إِلَهُ وَالصَّلُوْثُ وَالطَّبِيَّاتُ . أَسْلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَبَرَكَاتُهُ . أَسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِيْحِينَ . أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

উচ্চারণ: আন্তাহিয়াতু শিল্পাই উয়াস সালাত্যাতু উয়াত্তায়িবাতু। আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়ু উয়া রাহমাত্তুল্লাই উয়া বারাকাতুরু। আসসালামু আলাইলা উয়া আলা ইবাদিল্লাইস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইলাহাতু উয়া আশহাদু আলু মুহাম্মাদান আবদুরু উয়া রাসুলুরু।

অর্থ : আমাদের সব সালাম, শুভ্যা, আমাদের সব সালাত এবং সব পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ তাল্লালায় জন্য। হে নবি! আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বাল্দাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মারুদ নেই। আরও সাক্ষ্য দিছি যে, হফরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বাস্তা এবং রাসুল।

দরুদ

সালাতে তাশাহুদের পর দরুদ পড়তে হয়। দরুদ হলো-

আল্লাহুম্বা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁ ওয়া আলা আলি
 মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা
 ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ
 আল্লাহুম্বা বারিক আলা মুহাম্মাদিঁ ওয়া আলা আলি
 মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা
 ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلِي
 مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَعَلَى أَلِي إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَسِينٌ مَجِيدٌ
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلِي
 مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَعَلَى أَلِي إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَسِينٌ مَجِيدٌ

অর্থ: হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত কর হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি যেমন তুমি রহমত নাজিল করেছ হ্যরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিচয়ই তুমি অতি উন্নত গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ! বরকত নাজিল কর হ্যরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর বংশধরদের উপর যেমন তুমি হ্যরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের উপরে করেছ। নিচয়ই তুমি অতীব সৎগুণবিশিষ্ট ও মহান।

দোয়া মাসুরা

কুরআন-হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলোকে দোয়া মাসুরা বলা হয়। সালাতে দোয়া মাসুরা পড়া ভালো। মহানবি (স) সালাতে দোয়া মাসুরা পাঠ করতেন। সালাতে দরুদের পর এই দোয়া মাসুরাটি পড়া হয়।

আল্লাহুম্বা ইন্নি যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাওঁ
 ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইন্না আনতা ফাগফিরলী
 মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা
 আনতাল গাফুরুর রাহীম।

اللَّهُمَّ انِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي طَلِيْمًا كَثِيرًا
 وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي
 مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ
 أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অধিক পরিমাণে জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করার ক্ষমতা কারো নেই। (অতএব আমি আমার অপরাধসমূহের জন্য তোমার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। আমার উপর রহমত বর্ষণ কর, আমার উপর অনুগ্রহ কর। নিচয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

সালাম—سلام

সালাতের শেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো সালাম। দোয়া মাসুরা পড়ার পর অথবে ডানে ও পরে বামে সালাম ফেরাতে হয়। সালামের বাক্যটি হলো :

السلام علىك ورحمة الله وبركاته

অর্থ : তোমাদের উপর শান্তি ও আশ্চর্যের রহমত বর্ণিত হোক।

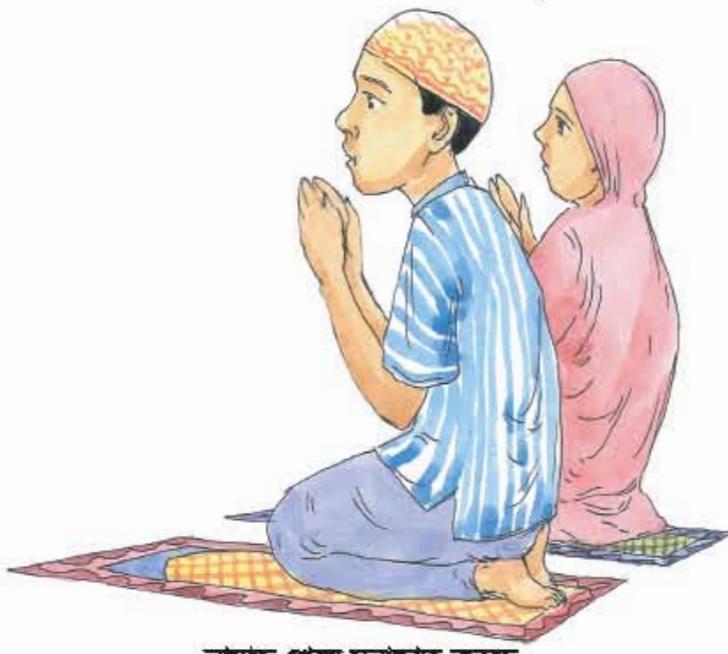
মুনাজাত—مناجة

আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন-নিবেদন, কারুতি-মিলতি করাকে মুনাজাত বা দোয়া বলে। প্রত্যেক ফরজ সালাত শেষে মুনাজাত করুণ ইত্যাকার একটি উপবৃক্ত সময়। এ সময় যে কোনো ভালো দোয়া করা যায়। কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফে অনেক মুনাজাত আছে। একটি সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর মুনাজাত হলো:

رَبَّنَا اتَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي
অর্থঃ আত্মনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাত্ত্ব ওয়াকিল

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এ দুনিয়ায় কল্যাণ দাও আর আধিরাতেও কল্যাণ দাও এবং দোষখের শান্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। — সুরা বাকারা-২০১



নামাজ শেষে মুনাজাত করছে

সালাত - *صلوة*

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত বা নামায। সালাতের কভকগুলো নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলো পালন করা ফরজ।

সালাতের আহকাম - *أحكام الصلوة*

সালাত শুরুর আগে সাতটি ফরজ কাঞ্জ করতে হয়। এগুলোকে বলে সালাতের আহকাম। আহকাম ঠিকমতো পালন না করলে সালাত আদায় হয় না।

- ১। খরীর পাক হওয়া ২। কাপড় পাক হওয়া ৩। সালাতের জায়গা পাক হওয়া
- ৪। সতর ঢাকা ৫। কিবলামুখী হওয়া ৬। নিয়ত করা
- ৭। সময়মতো সালাত আদায় করা।

সালাতের উরাত - *أوقات الصلوة*

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহ তায়ালার আদেশ। সময়মতো আদায় না করলে সালাত আদায় হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, “সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনের জন্য ফরজ।” সালাতের নির্দিষ্ট সময় হলো :

ফজুর	রাত শেষে পূর্ব আকাশে সাদা আতা দেখা দিলে ফজুর শুরু হয়। সূর্য উঠার পূর্ব মুহূর্তে তা শেষ হয়।
যোহুর	দুপুরে সূর্য পঞ্চম নামতে আরম্ভ করলে যোহুর শুরু হয়। আর কোনো কাঠির ছারা সে কাঠির মুলছারা বাদে তার বিপুল হলে তা শেষ হয়।
আসর	যোহুর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসর শুরু হয়। সূর্য ডোবার পূর্বে তা শেষ হয়।
মাগরিব	সূর্য ডোবার পর মাগরিব শুরু হয়। পঞ্চম আকাশে আলোর লাল আতা মুছে বাওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়।
এশা	মাগরিব শেষ হওয়ার পর এশা শুরু হয়। ফজুরের পূর্ব পর্যন্ত এশার সালাতের সময় থাকে। তবে যখন রাতের পূর্বে এশার সালাত পড়া ভালো।

সালাতের আরকান—أركان الصلاة

সালাতের ভিতরে সাতটি ফরজ কাজ আছে। এগুলোকে সালাতের আরকান বলে। যথা:

- ১। ভাকবির-ই-ভাহরিমা বা আল্লাহ আকবর বলে সালাত শুরু করা।
- ২। কিমায় অর্ধাং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। তবে কোনো কারণে দাঁড়াতে অসম্ভব হলে বসে, এমনকি শুয়েও সালাত আদায় করা যায়।
- ৩। কিমাত অর্ধাং কূরআন মজিদের কিছু অংশ তিলাউতাত করা।
- ৪। রূক্ত করা।
- ৫। সিজদাহু করা।
- ৬। শেষ বৈঠকে কসা।
- ৭। সালাম-এর মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

এর কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত আদায় হয় না। তাই এগুলো আদায়ের ব্যাপারে আমরা খুবই সাবধান থাকব।

সালাত আদায়ের নিয়ম

সালাত সবচেয়ে বড়
ইবাদত। মহানবি (স)
যেভাবে সালাত আদায়
করতেন আমরাও সেভাবে
সালাত আদায় করব। আমরা
সালাত আদায়ের জন্য
দাঁড়াব। আমাদের মুখ
ধাকবে পবিত্র কিবলার
দিকে। আমরা পাকসাফ হয়ে
সারা জাহানের বাদশাহ আল্লাহ
তায়ালার দরবারে হাজির
হব। সালাতে ঘা ঘা পড়বো
তার অর্থ জেনে নেব।



কিবলামুখী হয়ে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায়

সর্ববেশম বচন : আল্লাহু আকবর— بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

মুখে এ বিচাট অঙ্গীকার করে পৃথিবীর বাবতীয় জিনিস হতে নিজের সম্মর্ক ছিন্ন করব।
প্রতীক হিসেবে কান পর্যন্ত দুই হাত তুলব। এরপর সারা আহানের বাদশাহৰ সামনে
আল্লাহু আকবর বলে হাত বেঁধে দোড়াব।



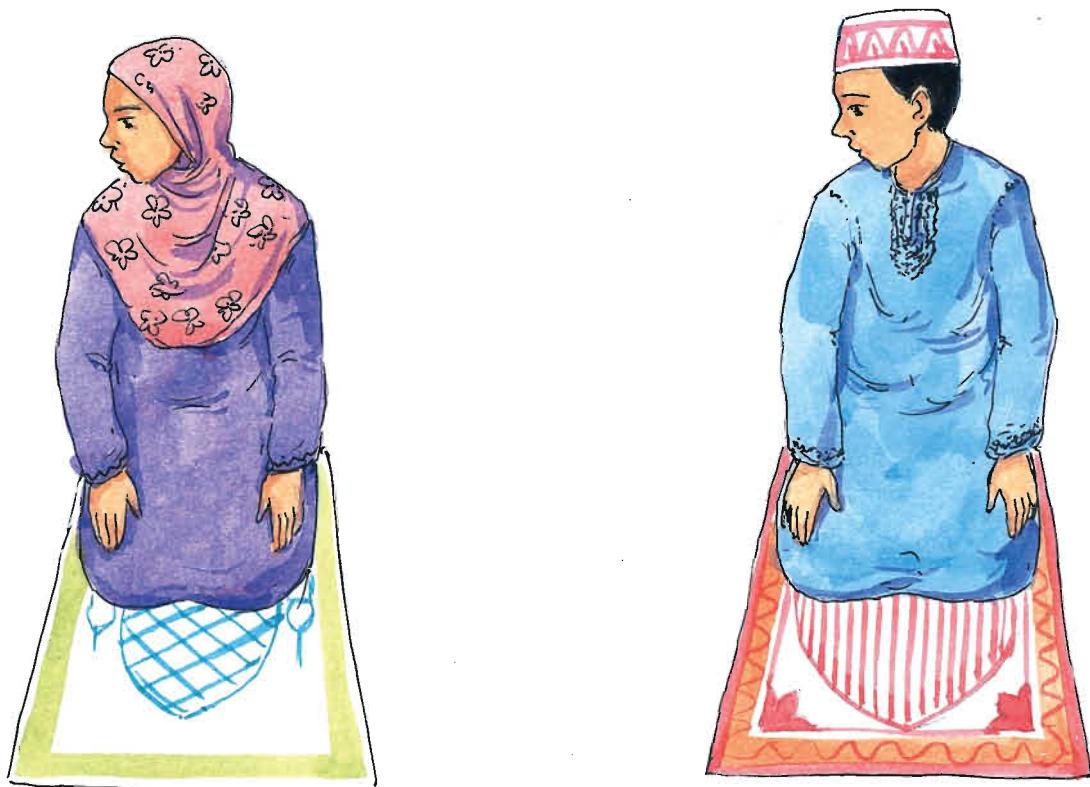
তাফবিরে ভাইরিমার দৃশ্য

এরপর বিনয় সহকারে সানা পড়ব। সানা হলো—

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা উয়াবিহামদিকা উয়া তাবারাকসম্মুকা উয়াতায়ালা জান্দুকা উয়া শা
ইলাহা গাইয়ুকা।

এরপর আউবু ক্লিয়াহি মিনাশ শায়তনির রাখিম এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাখীম পড়ব।
তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা বা সূরার অংশ পাঠ করব। আল্লাহু
আকবর বলে ঘূর্ণ করব। ঘূর্ণতে তিনবার সুবহানা রাখিয়াল আরীম পড়ব। সাথি আল্লাহু
গিমান হামিদাহ বলে সোজা হয়ে দোড়াব। দোড়ানো অবস্থার রক্বানা শাকাল হামদ বচন।
এরপর আল্লাহু আকবর বলে সিজদাহু করব।

এরপর আল্লাহু আকবর বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা পাঠ করব। পরে প্রথম রাকআতের মতো রুকু সিজদাহ করে স্থির হয়ে বসব। তাশাহহুদ, দরবুদ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করব। এরপর প্রথমে ঢান দিকে মুখ ফিরিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। এভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করব।



সালাম ফেরানোর দৃশ্য

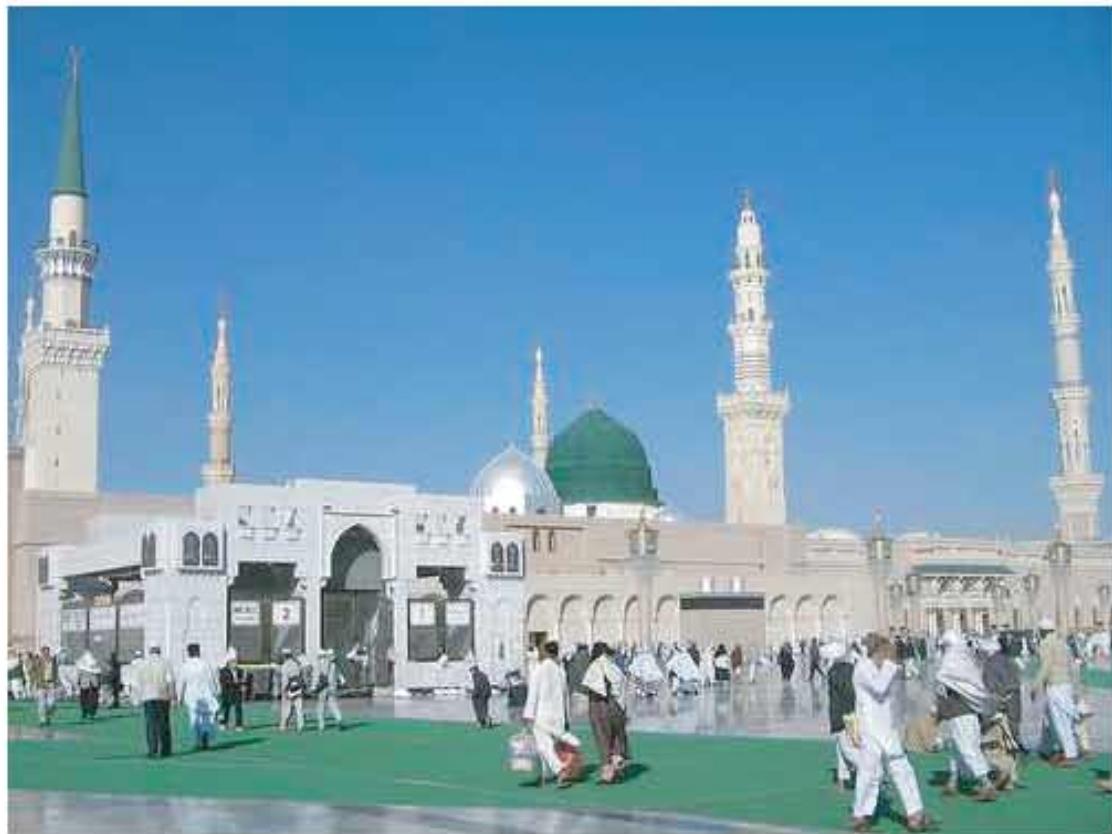
যদি তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত হয় তবে আবদুহু ওয়া রাসুলুহু পর্যন্ত পড়ে আর বসব না। আল্লাহু আকবর বলে উঠে দাঁড়াব। তারপর আগের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত পড়ব। তবে ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করব।

মহানবি (স) জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতেন। আমরাও জামাআতের সাথে সালাত আদায় করব।

জুমুআর সালাত

প্রতিদিন শুক্রবার মসজিদে জামাআত হয়। পাড়ার, মহকুমার লোকজন একসাথে সালাত আদায় করেন। এতে পরম্পরা দেখা-সাক্ষাৎ হয়, কৃষ্ণনির্মাণ করা যায়। সুখে-সুখে একে অনেকের সাহায্য-সহযোগিতার স্মরণ হয়।

প্রতি সন্ধিতে জামে মসজিদে আরও বড় আকারে জুমুআর জামাআত হয়। শুক্রবারে জুমুআর সালাতের জন্য অনেক মুসলিম সমাবেশ ঘটে। আল্লাহক বলেন, “জুমুআর দিন আযান হলে সালাতের জন্য সূক্ষ্ম যাও। বেচাফেলা বশ্য রাখ। সালাত শেষে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর রহমত ভাসাপ কর।”



মসজিদে নববী

জুমুআর দিন গোসল করা, ভালো পোশাক পরা, আত্মরমাণ্ডা সুন্নত। এদিন বোহরের সালাতের পরিবর্তে জুমুআর দুই রাকআত সালাত করাজ।

ফরজ সালাতের আগে চার রাকআত কাবলাল জুমুআ সালাত পড়া সুন্নত। ফরজের পর চার রাকআত বাদাল জুমুআ সালাত পড়াও সুন্নত। এ ছাড়া সময় পেলে নফল সালাত পড়াও উচ্চম। জুমুআর সালাত যোহরের ওয়াক্তেই জামাআতে আদায় করতে হয়। জামাআত ছাড়া জুমুআর ফরজ আদায় হয় না।

জুমুআর জন্য দুটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আযান মিনারায় বা মসজিদের বাইরে দিতে হয়। ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিস্বারে বসলে দ্বিতীয় আযান দিতে হয়। এরপর ইমাম মিস্বারে দাঁড়িয়ে দুটি খুতবা দেন। খুতবা অর্থ বক্তৃতা। খুতবায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়।

খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা বা অন্য কিছু করা যায় না। এমনকি সালাত আদায় করাও নিষেধ।

খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকআত ফরজ সালাত আদায় করতে হয়। ফরজের আগে নিয়ত করব, “আমি কিবলামুখি হয়ে আল্লাহর ওয়াক্তে দুই রাকআত জুমুআর ফরজ সালাত এই ইমামের সাথে পড়ার নিয়ত করলাম আল্লাহু আকবর।” তবে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বা পড়া আবশ্যিক নয়।

জুমুআর সালাত মোট দশ রাকআত। চার রাকআত কাবলাল জুমুআ সুন্নত। দুই রাকআত ফরজ। চার রাকআত বাদাল জুমুআ সুন্নত।

ঈদের সালাত

ঈদ হলো খুশির দিন। বিশ্বের মুসলিমগণ দুটি ঈদ উৎসব করেন। একটি রোয়ার শেষে ঈদুলফিতর। আরেকটি হলো কুরবানির ঈদ বা ঈদুলআযহা। ঈদের দিন সারা এলাকার মুসলিমগণ ঈদগাহে একত্রিত হন। দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঈদের সালাত পড়া ওয়াজিব।

ঈদুলফিতর

পবিত্র রম্যান মাসে সিয়াম সাধনার পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন হলো ঈদুলফিতর এর দিন। ঈদ অর্থ আনন্দ। ফিতর অর্থ রোয়া ভঙ্গ করা। দীর্ঘ একমাস রোয়া রাখার তাওফিক দানের জন্য মুসলিমগণ এদিন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এটি নিষ্ক আনন্দ উৎসবের দিন নয়।

এদিন পাড়া-প্রতিবেশী, গরিব-দুঃখীর খোজখবর নিতে হয়। বিধবা, ইয়াতীম, সকলের মুখে সাধ্যমতো হাসি ফুটানোর চেষ্টা করতে হয়। ধনীদের উপর এ দিন সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। কারণ আনন্দের দিন যাতে কেউ অভুক্ত না থাকে। ঈদের দিনে রোয়া রাখা হারাম।

ঈদের দিনের সুন্নত: সকালে গোসল করা, খুশবুমাখা, পরিষ্কার কাপড় পরা, মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া, ঈদের সালাত মাঠে আদায় করা।

ইমামের সাথে দুই রাকআত ঈদুলফিতরের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এতে ছয়টি অতিরিক্ত ওয়াজিব তাকবির দিতে হয়।

ঈদের সালাত আদায় করার নিয়ম

প্রথমে কাতার করে ইমামের পিছনে দাঁড়াব। নিয়ত করব। আল্লাহু আকবর বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে তাহরিমা বাঁধব। সানা পাঠ করব। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ইমামের সাথে তিন তাকবির দিব। প্রথম দুইবার হাত না বেঁধে ছেড়ে রাখব। তৃতীয় তাকবির দিয়ে সালাতে হাত বাঁধার মতো দুই হাত বাঁধব। এরপর ইমাম সাহেব অন্যান্য সালাতের মতো সূরা ফাতিহা ও যে কোনো সূরা পাঠ করবেন এবং যথারীতি বুকু সিজদাহ করে প্রথম রাকআত শেষ করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা ও যে কোনো সূরা পাঠ করবেন। এরপর তিন তাকবির দিবেন। আমরাও তিনবার আল্লাহু আকবর বলব। তিনবারই কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে নামিয়ে রাখব, হাত বাঁধব না। পরে চতুর্থবার আল্লাহু আকবর বলে বুকু করব।

এরপর অন্যান্য সালাতের মতো সিজদাহ করব, তশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পাঠ করে ইমামের সাথে সালাম ফিরাব। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুইটি খুতবা দেবেন। খুতবা শোনা ওয়াজিব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ঈদুলফিতর-এর দিনের করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

ঈদুলআয়হা

দ্বিতীয় ঈদ হলো ঈদুলআয়হা বা কুরবানির ঈদ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আল্লাহর নির্দেশে এদিন হ্যরত ইবরাহীম (আ) নিজপুত্র হ্যরত ইসমাইল (আ)-কে আল্লাহর নির্দেশে কুরবানি করতে তৈরি হন। তাঁর এ ত্যাগের স্মৃতি স্বরূপ মুসলমানের উপর

কুরবানি ওয়াজিব করা হয়েছে।

যিলহজ মাসের দশম তারিখ ঈদুলআযহার দিন। ঈদুলফিতরের মতো এদিনও গোসল করে খুশবু মেখে পরিষ্কার কাপড় পরে ঈদগাহে একই নিয়মে দুই রাকআত ওয়াজিব সালাত আদায় করতে হয়। সালাত শেষে ইমাম দুইটি খুতবা দেবেন। খুতবা শোনা ওয়াজিব। এদিন সালাতের আগে কিছু না খাওয়া ভালো। রাস্তায় জোরে জোরে তাকবির পড়া সুন্নত।

ঈদের তাকবির হলো: আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

যিলহজ মাসের নবম তারিখ ফজর থেকে তের তারিখ আসর পর্যন্ত ফরজ সালাত শেষে এই তাকবির পড়া ওয়াজিব। ঈদুলফিতরের দিন এই তাকবির আস্তে আস্তে পড়তে হয়।

সালাত শেষে কুরবানি করতে হয়। কুরবানির গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রাখব, একভাগ আত্মায়দের মাঝে বিতরণ করব, আরেক ভাগ গরিবদের মাঝে বণ্টন করব। এভাবে ঈদের খুশিতে সবাই শরিক হতে পারে। এতে সমাজে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আমরা ঈদের এ মহান শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করব। সবার সঙ্গে মিলেমিশে ঈদের আনন্দ উপভোগ করব। ঈদের এ শিক্ষাকে সমাজে ছড়িয়ে দেব।

অনুশীলনী

নৈর্বাচিক প্রশ্ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দাও

১। ওয়ুর ফরজ কয়টি?

ক. ৩টি

খ. ৪টি

গ. ৫টি

ঘ. ৬টি

২। সালাতের আরকান কয়টি?

- গ. ৫টি

৩। সালাতের আহকাম কয়টি?

- ଗ. ୬୩ ଘ. ୭୩

৪। সালাত কয় ওয়াক্ত ?

- ## କ. ୬ ଓ ଯାତ୍ରା ଖ. ୭ ଓ ଯାତ୍ରା

- ## ଗ. ୫ ଓ ଘ. ୩ ଓୟାକ୍ଟ୍

৫। সালাতে দরুদ কখন পড়তে হয়?

- গ. রুক্মিণী
ঘ. শেষ বৈঠকে

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক. পরিগ্রহা ----- অঙ্গ।

- খ. তাহারাত অর্থ -----।

- গ. সালাতের আগে ----- করতে হয়?

- ଘ. ଓୟ ଛାଡ଼ା ----- ହ୍ୟ ନା ।

- ঙ. জুমুআর ----- রাকআত সালাত ফরজ।

গ. রেখা টেনে মেলাও :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ১) আল্লাহ ছাড়া কারো | চারটি |
| ২) পবিত্রতা ইমানের | সাতাত |
| ৩) ওয়ুর ফরাজ | আনন্দ |
| ৪) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো | অঙ্গ |
| ৫) ঈদ অর্থ | ইবাদত কর না |

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লেখ।
২. তাহারাত সম্রক্ষে মহানবি (স) কী বলেন ?
৩. আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম এর অর্থ কী?
৪. মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত কখন শুরু ও শেষ হয় ?
৫. ঈদের দিনের সুন্নত কাজগুলো কী কী ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১. ইবাদত শব্দের অর্থ কী ? ইবাদত কাকে বলে ?
২. ওয়ুর ফরজ কয়টি ও কী কী ?
৩. গোসলের ফরজ কয়টি ও কী কী ?
৪. আযানের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৫. সালাতের আহকাম কয়টি ও কী কী লেখ।
৬. সালাতের আরকান কয়টি ও কী কী ?
৭. সালাতের সামাজিক গুণাবলি বর্ণনা কর।
৮. ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম লেখ।
৯. ঈদের সালাতের সামাজিক তাৎপর্য লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক (الْأَخْلَاقُ)

যানুষের ইত্তাব ও চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলে। চরিত্র ভালো হলে জীবন সুস্পর্শ হয়। সুখের হয়। আবিরামতে শান্তি পাওয়া যায়। সুখ পাওয়া যায়। সুস্পর্শ ও ভালো চরিত্রই সচরিত্র। যেমন সত্য কথা বলা। গোপীর সেবা করা। আবো-আশ্বাকে সম্মান করা। প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা।

মদ ইত্তাব ও খারাপ চরিত্রকে অসচরিত্র বলা হয়। চরিত্র অসৎ হলে কেউ তাকে ভালোবাসে না। সকলে শূণ্য করে। তার সাথে কেউ মেলামেশা করে না। খেলা করে না। আল্লাহ তাকে অগভূত করেন। মদ ইত্তাব ও খারাপ চরিত্র হলো মিথ্যা কথা বলা, লোভ করা, অপচয় করা, পরনিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

আমাদের মহানবি (স) ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “নিচয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

মহানবি (স) বলেন, “সত্যকার মুমিন তাবাই, যাদের চরিত্র সুস্পর্শ।”

নিচে সচরিত্র এবং অসচরিত্রের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

	সচরিত্রের তালিকা		অসচরিত্রের তালিকা
১	আবো-আশ্বার সাথে ভালো ব্যবহার করা	১	আবো-আশ্বার সাথে খারাপ ব্যবহার করা
২	শিক্ষককে সম্মান করা	২	লোভ করা
৩	বড়দের সম্মান করা	৩	অপচয় করা
৪	হোটদের জেব করা	৪	পরনিষ্ঠা করা
৫	সত্য কথা বলা ও খোদাদা পুরণ করা	৫	অহংকার করা
৬	সালাত আদায় করা	৬	সালাত আদায় না করা

আমরা চরিত্র সুন্দর করব। সকলে আমাদের ভালোবাসবে। আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হবেন। দুনিয়াতে আমরা শান্তি পাব। পরকালে পাব জান্নাত।

আমরা সর্বদা-

ইমান আনব, সালাত আদায় করব।

আবৰা-আম্মা, শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করব।

ছেটদের মেহ করব, সত্য কথা বলব।

স্বভাব চরিত্র সুন্দর করব, শান্তি পাব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা সচরিত্রের একটি তালিকা তৈরি করবে।

আবৰা-আম্মাকে সম্মান করা

আবৰা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। তাঁরা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেন। মেহ-মমতা ও দরদ দিয়ে লালন-পালন করেন। না খেয়ে আমাদের খাওয়ান। আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে তাঁরা সেবাযন্ত্র করেন। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আমাদের সুখে তাঁরা সুখী হন। আনন্দ পান। আমাদের কষ্টে কষ্ট পান। দুঃখ পান। তাঁরা সবসময় আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। দোয়া করেন।

সবসময় আবৰা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। আমরা তাঁদের সম্মান করব। শুন্ধা করব। তাঁদের সাথে রাগারাগি করব না। বাগড়া-বিবাদ করব না। কর্কশ ভাষায় কথা বলব না। তাঁদের মনে কষ্ট দেব না। সব সময় হাসিমুখে কথা বলব। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আবৰা-আম্মাকে সালাম দিয়ে বের হব। আবার বাড়িতে ফিরে আসলে আবৰা-আম্মাকে সালাম জানাব। সুন্দর সুন্দর কথা বলব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “**قُلْ لِهُمَا قُوْلًا كَرِيمًا**” (কুল লাহুমা ক্রাওলান কারীমা)।”

অর্থ : তুমি আবৰা-আম্মার সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বল।

তাঁদের ভালো খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করব। তাঁদের অসুখ হলে সেবাযন্ত্র করব। তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। তাঁরা বুড়ো হয়ে গেলে তাঁদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করব। তাঁদের কাজে ও চলাফেরায় সাহায্য করব।

আল্লাহ বলেন, “**وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا**” (ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা)।”

অর্থ: আবৰা-আম্মার সাথে উভয় ব্যবহার করো।

আব্বা—আম্মার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি আমাদের অনেক কর্তব্য রয়েছে। আব্বা—আম্মার জিন্দাব যদি কোনো র্খণ থাকে তা পরিশোধ করব। দান—খয়লাত এবং নকল ইবাদত করে তাঁদের আব্বা-আম্মার মাধ্যমেরাত চাইব। যজ্ঞ কামনা করব। আমরা সবসময় আব্বা—আম্মার জন্য দোয়া করব—

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَيْمًا رَبِّيْنِيْ صَغِيرًا۔ (রাবির হামহুমা কামা রাবাইয়ানী সাগীরা)।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক, আমার আব্বা—আম্মা আমাকে ছোটকেোৱা যেমনি সেবায়েছে লাগন-পালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি তেমনি দয়া করুন।

মহানবি (স) বলেছেন, “মায়ের পায়ের নিচে সজ্জানের জালাত।”

আমরা সর্বদা—

আব্বা—আম্মার কথা শুনব ও মানব।

তাঁদের শ্রদ্ধা করব, সম্মান করব।

তাঁদের অবাধ্য হব না।

তাঁদের জন্য আঙ্গাহর কাছে দোয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ: কী কী উপায়ে আব্বা—আম্মার সম্মান করা যায়, শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

إِكْرَامُ الْمُعْلِمِ ()

আব্বা—আম্মার মতো শিক্ষক আমাদের প্রকৃত মানুবত্বপে গড়ে তোলেন। তিনি আমাদের কুরআন, সালাত ও আদব—কায়দা শেখান। তিনি সৎ ও ন্যায়ের পথে চলতে শেখান। অন্যায় ও অসৎ পথে চলতে নিবেধ করেন। তিনি আমাদের আপনজন। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব।

কেমনভাবে শিখতে হয়? কীভাবে পড়তে হয়? এসব শিক্ষক আমাদের শেখান। জ্ঞান—বিজ্ঞানের নানা বিষয় আমরা তাঁর কাছে শিখি। কুরআন ও হাদিসের কথা শিখি। দেশ ও দশের কথা শিখি। আমরা তাঁকে সম্মান করব। তাঁকে ঘর্যাদা দেব।

শিক্ষকের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করব। তাঁর সাথে দেখা হলে তাঁকে সালাম দেব। তাঁকে ভালোমদ জিজ্ঞাসা করব। তিনি শ্রেণিকক্ষে যা পড়াবেন মনোযোগ দিয়ে শুনব। তাঁর সাথে সবসময় নম্রভাবে কথা বলব। তিনি শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় যদি বাইরে বাঁওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁর অনুমতি নিয়ে থাব। তিনি অসুস্থ হলে তাঁকে দেখতে যাব।

তাঁর সেবাযত্ত করব। তাঁর আদেশ-উপদেশ মেনে চলব। তাঁর সাথে কথনো বেয়াদবি করব না। সব সময় তাঁর কথা শুনব। তাঁর অন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব।

আমরা উয়াদা করব,

শিক্ষকের আদেশ-উপদেশ মানব
তাকে সালাম দেব, তাঁর সেবা করব
তিনি যা শেখাবেন মন দিয়ে শিখব
তাকে সম্মান করব, দোয়া করব।

(إِكْرَامُ الْكِبَارِ وَإِذْ حَامُ الصِّغَارُ)

আবরা-আচ্ছা আমাদের আদর করেন। দাদা-দাদি ও নানা-নানি আদর করেন। শিক্ষক আমাদের স্নেহ করেন। যারা বয়সে বড় তাঁরা আমাদের ভালোবাসেন। স্নেহ করেন। আমরা বড়দের সম্মান করব।

যেসব ছেলেমেয়েরা আমাদের উপরের শ্রেণিতে গড়ে আমরা তাদের সম্মান করব। আমাদের বাড়ির ধেসব কাজের লোক বয়সে বড় আমরা তাদের শুশ্রা করব। সম্মান করব।

যারা বয়সে বড় তাদের সাথে দেখা হলে আমরা তাদের সালাম দেব। আদবের সাথে কথা বলব। ভালো ব্যবহার করব। আদেশ-উপদেশ মেনে চলব।

আমাদের ছেট তাইবোন আছে। নিচের শ্রেণিতে অনেক ছেলেমেয়ে পঢ়াশোনা করে। যারা আমাদের চেয়ে বয়সে ছেট, আমরা তাদের আদর করব। স্নেহ করব। তারা কাঁদলে মাঝায় হাত বুশিয়ে দেব। কোলে নেব। ভালো কথা শেখাব। তাদের কাঁদাব না। মারব না। গালি দেব না। তাদের সালাম দেওয়া শেখাব। পড়া বলে দেব।

বাস, স্টিমার বা অন্য কোনো বানবাহনে বৃন্দ লোক উঠেন। কসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা বসে ধাকলে উঠে দাঁড়াব। তাদের বসতে দেব। তাঁরা খুশি হবেন। আমাদের অন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ খুশি হবেন।

ফুর্যাদ চতুর্থ শ্রেণিতে গড়ে। যারা তাঁর চেয়ে বয়সে বড়, সে তাদের সালাম দেয়। শুশ্রা করে। সম্মান করে। যারা তাঁর চেয়ে বয়সে ছেট, সে তাদের আদর করে। স্নেহ করে। সকলে ফুর্যাদকে ভালোবাসে।

মহানবি (স) বড়দের সম্মান করতেন। ছেটদের স্নেহ করতেন। সকলের সাথে তালো ব্যবহার করতেন। মহানবি (স) বলেন, “যে ছেটদের স্নেহ করে না, আর বড়দের সম্মান দেখায় না, সে আমার উচ্চত না।”

আমরা সর্বদা—

বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করব
ছেটদের আদর ও স্নেহ করব
বড়-ছেটের মধ্যে তালো সমর্ক গড়ব
আত্মাহকে খুশি রাখব।

পরিকল্পিত কাজ: কীভাবে বড়দের সম্মান এবং ছেটদের স্নেহ করতে হয় পিকার্ডিঙ্গ তা খাতার শিখবে।

প্রতিবেশীর সাথে তালো ব্যবহার (حُسْنُ السُّلُوكِ بِالْجَارِ)

আমাদের আশেপাশে যারা বসবাস করে তারা আমাদের প্রতিবেশী। বাস, টেল, লক, স্টিমারে সহযাত্রী আমাদের প্রতিবেশী। বিভিন্ন জাতীয় অবস্থানকারী ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের প্রতিবেশীর মতো।

আমরা প্রতিবেশীর সাথে তালো ব্যবহার করব। তাদের সাথে কৃশল বিনিময় করব। কেউ ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য দেব। মহানবি (স) বলেছেন, “যে নিজে পেটভরে খায় অর্ধ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে যুগ্মন নয়।”

প্রতিবেশী অসুস্থ হলে দেবা করব। বিশেষ সাহায্য করব। তার যাতায়াতের নাস্তা বল্প করে দেব না। তার সূর্খে খুশি হব। তার কক্ষে কষ্ট পাব। বেধানে সেখানে ঘয়লা-আবর্জনা কেলব না। জোরে টেশিডিল, রেডিও-ক্যাসেট বাজাব না, যাতে প্রতিবেশীর অসুবিধা হয়।

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করব না। কষ্ট দেব না। হিসা করব না। মিলেমিলে থাকব। তাহলে পরিকেশ সূন্দর হবে। সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। আত্মাহ খুশি হবেন। পরকালে জান্মাত পাওয়া থাবে। আর যদি প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করি, হিসা করি তাহলে আত্মাহ অসন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়াতে শান্তি পাব না। পরকালেও শান্তি পাব না।

মহানবি (স) বলেন, “যার অভ্যাচন ও অন্যায় আচরণ থেকে তার প্রতিবেশী ইক্ষু পায় না, সে আল্লাহ'কে প্রবেশ করবে না।”

প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তার বাসায় যাব। বাসায় সবাইকে সাজ্জনা দেব। সহানুভূতি আনাব। আনাজায় শরিক হব। ভালো ব্যবহার করব। যদি প্রতিবেশী হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের লোকজন হয়, তাদের সাথেও সুন্দর ব্যবহার করব। সকল প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করব। আজ্ঞাহ খুলি হবেন। মহানবি (স) বলেন, “আল্লাহ'কাছে সেই প্রতিবেশী সবচেয়ে উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।”

আমরা সর্বদা—

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করব, বিপদে সহায় করব, অসুখ হলে সেবা করব, অগভূত করব না, কষ্ট দেব না, যিশেমিশে ধাকব, শান্তি বজায় রাখব।

পরিকল্পিত কাজ: প্রতিবেশীর প্রতি বেসব কর্তব্য পালন করতে হয় শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

রোগীর সেবা করা (عِيَادَةُ الْمَرِيضِ)

আমাদের বাড়িতে আবা—আম্মা, দাদা—দাদি, ভাইবেন আছেন। বাড়ির আশেপাশে প্রতিবেশীরা আছেন। বিদ্যালয়ে সহপাঠীরা আছে। আজীবন—জন্ম ও বেলার সাথি আছে।

আমাদের মধ্যে কারও ঘূর হয়। নানা ইক্ষুমের ঝোঁগ হয়। অসুখ হয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে অসুস্থ হয়ে যাই। শরীর দুর্বল হয়ে থাক। অসহায় বোধ করি। ঘূর হলে ভীষণ খারাপ লাগে। কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না। তখন চিকিৎসার দরকার। ডাঙ্কার ডাকা দরকার। সেবায়জ্ঞের প্রয়োজন। ঘূর হলে মাথায় পানি দেওয়া প্রয়োজন। ঘূরের মাজা বেশি হলে সমস্ত শরীর ভেঙা কাগড় দিয়ে মুছিয়ে দিতে হবে। ডাঙ্কারের প্রামাণ্য ও শুধু খেতে হবে। রোগীর সেবা করতে হবে। ইনশাআল্লাহ ঝোঁগ ভালো হয়ে যাবে। ঝোঁগ থেকে মুক্তি পাবে।

অসুখ—বিসুখ ও রোগশোক আল্লাহ'র পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য একটি পরীক্ষা। রোগীর সেবা করতে হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মহানবি (স) সকলময় রোগীর সেবা করতেন।

মহানবি (স) বলেছেন, “عُوْدُوُالْمَرِيضَ” অর্থ, তোমরা রোগীর সেবা কর।

ফুরাদ খুব ভালো হলে। একবার তার আম্মার ভীষণ ঘূর হলো। বাসায় আর কেউ নেই। সে তার আম্মার চিকিৎসার জন্য ডাঙ্কার ডেকে নিয়ে আসলো। ডাঙ্কার সাহেব তার আম্মাকে



অসুস্থ মাকে সেবা করছে

পরীক্ষা করে বলল, “ফুয়াদ, তোমার আশ্চর্য মাধ্যম পানি দাও। আর এই ভবুৎ সময়মতো ধারণাবে। ইনশাঅল্লাহ তালো হয়ে যাবে।” ফুয়াদ সময়মতো তার আশ্চর্যকে ভবুৎ খোওয়াল। মাধ্যম পানি দিল। আল্লাহর কাছে তার আশ্চর্য আরোপ্য লাভের জন্য দোয়া করল। আল্লাহর রহমতে তার আশ্চর্য সুস্থ হয়ে উঠলেন। ফুয়াদ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করল।

আমরা ব্রাহ্মীর সেবাযত্ত করব, তার ধৌজখবর নেব, আল্লাহর কাছে আরোপ্যের জন্য দোয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ: কী কী উপায়ে ব্রাহ্মীর সেবা করা যাব শিক্ষার্থীরা তা ধারণা শিখবে।

সত্যকথা বলা (قَوْلُ الصِّدْقِ)

সত্যকথা বলা মহৎ গুণ। যে সত্যকথা বলে তাকে সত্যবাদী বলে। সত্যবাদীকে আরবিতে সাদিক (صَادِقٌ) বলা হয়।

যে সত্যকথা বলে তাকে সকলে ভালোবাসে। সকলে বিশ্বাস করে। আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। সে আল্লাহর কাছে প্রিয়। পৃথিবীতে সে সকলের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত। পরকালে সে আল্লাত লাভ করবে।

মিথ্যা সকল পাপের মূল। যে মিথ্যাকথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলে। আরবিতে তাকে কাযিব (ঢুঁট) বলা হয়। মিথ্যাবাদীকে কেউ তালোবাসে না। বিশ্বাস করে না। সকলে তাকে ঘৃণা করে। অগভূত করে। তার বিপদে কেউ সাহায্য করে না। আজ্ঞাহও তাকে ঘৃণা করেন। তালোবাসেন না। পরকালে তার জন্য জাহান্নাম।

আমাদের মহানবি (স) ছোটবেলা থেকে আজীবন সকলের কাছে সত্যবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সবসময় সত্যকথা বলেছেন। অন্যদেরকে সত্যকথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি। তাই সকলে তাকে সম্মান করতেন। শক্তি করতেন।

মহানবি (স) বলেন, “**সত্য ধানুষকে মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধরণে করে।**” মহানবি (স) আরও বলেন, “**তোমরা সবসময় সত্য বলবে। কেননা সত্য পুণ্যের গথে নিয়ে যাব। আর পুণ্য জাহান্নামে নিয়ে যাব।**”

একটি ঘটনা :

একদিন মহানবি(স)-এর কাছে একজন লোক এসে বলল, ‘হে আজ্ঞাহর নবি(স), আমি চূঁকি করি। মিথ্যা কথা বলি। আরও অনেক অন্যায় করি। এখন আমি এগুলো ছেড়ে দিতে চাই। কলুন, আমি প্রথমে কোনটি ছেড়ে দেব?’

মহানবি (স) বললেন, “**মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও।**” লোকটি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিল। আর মিথ্যা কথা ছেড়ে দেওয়ার কারণে সব অন্যায় থেকে সে বেঁচে গেল।

আমরাও সব-সময় সত্য কথা বলব, সকলের সম্মান ও আদর পাব, মিথ্যাকথা কলব না, জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাব।

পরিকল্পিত কার্য: সত্য কথার সুবল এবং মিথ্যা কথার কুবল শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

ওয়াদা পালন করা

ওয়াদা পালন করা অর্থ কথা দিয়ে কথা রাখা। কথামতো কাজ করা। চুক্তি রক্ষা করা। কাজও সাথে কোনো কথা দিলে তা রক্ষা করার নাম ওয়াদা পালন করা।

আমরা কথাবার্তার বা কাজের সাথে কোনো কথা দিয়ে থাকলে বা চুক্তি করলে তা পূরণ করব। তাহলে সবাই আমাদের বিশ্বাস করবে। তালোবাসবে। আজ্ঞাহও খুশি হবেন।

আজ্ঞাহ বলেন, “**হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা পূরণ কর।**”

যে ওয়াদা পালন করে সে সকলের কাছে প্রিয় হয়। সম্মানিত হয়। সকলে তাকে বিশ্বাস

করে, ভালোবাসে। বিপদে পড়লে সাহায্য করে। আল্লাহ তার প্রতি খুশি থাকেন। আধিরাতে সে সুখ পায়। শান্তি পায়। জান্নাত শান্ত করে।

ওয়াদা পালন না করা খুবই অন্যায়। মারাত্তক অপরাধ। যে ওয়াদা পালন করে না তাকে কেউ ভালোবাসে না। বিশ্বাস করে না। বিপদে সাহায্য করে না। সম্মান করে না। আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন না। আধিরাতে সে কষ্ট পাবে। সে জাহান্নামে শান্তি তোগ করবে।

আমাদের মহানবি (স) কাউকে কোনো কথা দিলে তা রক্ষা করতেন। ওয়াদা করলে তা পালন করতেন। মহানবি (স) এবং কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়ার সম্মিহন হয়েছিল। কুরাইশগণ বখন এ সম্মিহন অমান্য করল তখন মহানবি (স) এ সম্মিহন বাতিল করে দেন।

ওয়াদা পালন না করলে ধর্ম থাকে না। মহানবি (স) বলেন, “ যে ওয়াদা পালন করে না, তার ধর্ম নেই।”

আমরা কথা দিয়ে কথা রাখব, ওয়াদা পালন করব। কথামতো কাজ করব, মানুষের ভালোবাসা লাভ করব। কথনো ওয়াদা ভঙ্গ করব না, অবিশ্বাসী হব না। আল্লাহর প্রিয় হব, জান্নাত শান্ত করব।

পরিকল্পিত কাজ : ওয়াদা পালনের সুফল শিক্ষার্থীরা আতায় লিখবে।

লোভ না করা (تَرْكُ الْجِنْسِ)

যত পায় আরও চায়। বেশি বেশি চায়। এর নামই লোভ। লোভ করা পাপ। লোভ আমাদের অনেক ক্ষতি করে। অনেক অশান্তি সৃষ্টি করে। দুঃখ-কষ্ট বাঢ়ায়। লোভের কারণে মানুষ নানা অন্যায়ে লিপ্ত হয়। পাপ করে। সে সুর্খী হয় না। শান্তি পায় না।

যে লোভ করে তাকে লোভী বলে। লোভী মানুষকে কেউ ভালোবাসে না। সম্মান দেয় না। সকলে তাকে বৃণা করে। কেউ তার সাথে বস্তুত করে না। মেলামেশা করে না। তার বিপদে কেউ সাহায্য করে না। সে পাপী। আর এই পাপ তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়। ধর্মসের দিকে নিয়ে যায়। কথায় বলে- ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।’

একটি কাহিনী শুনো

হ্যারভ দাউদ (আ)-এর উপর যাবুর কিডাব নাজেল হয়েছিল। তিনি মধুর কষ্টে কিডাব পড়তেন। আর তা শোনার জন্য শনিবারে সমুদ্রের মাছ পর্যবেক্ষণ তীরে আসত। শনিবার তাদের মাছ ধরা নিষেধ ছিল। কিন্তু কিছু লোভী লোক সে নিষেধ অমান্য করল। তারা ঐদিন ফাঁদ

পেতে যাই আটকে রাখল এবং গরে থরল। অন্যায় করল। তাদের উপর আঞ্চলিক আজাব এল। এই লোভের কারণে তারা ধৰ্ম হয়ে গেল।

আমাদের মহানবি (স)-এর মধ্যে কোনো লোভ-লালসা ছিল না। মহানবি (স) বলেন, “তোমরা লোভ থেকে সাবধান থাক। লোভ তোমাদের পূর্ববর্তী গোকদের ধৰ্ম করে দিয়েছে।”

আমরা লোভ করব না, অন্যায় করব না।

ধৰ্ম হব না, লোভ থেকে বিরত থাকব।

পরিকল্পিত কাজ: লোভ-লালসার অপকার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা একটি কাহিনী খাতায় লিখবে।

অপচয় না করা (تَرْكُ الْإِسْرَافِ)

অপচয় অর্থ ক্ষতি, অপব্যয়, নষ্ট। বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছু নষ্ট করাকে অপচয় বলে। অপচয় করা বড় পাপ।

আঞ্চলিক বলেন, “إِنَّ الْبَلِلَرِينَ كَانُوا إِخْرَانَ الشَّيْطَنِينَ” (ইন্ন ব্লিলুরিন কানু ইখওয়ানাশ শায়াত্তিন)।

অর্থ : নিচয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।

আমরা অনেক সময় অনেক জিনিস নষ্ট করি। অপচয় করি। প্রয়োজনের বেশি খাবার নিই। খেতে পারি না। ফেলে দেই। বিনা প্রয়োজনে কুলের ও ঘরের বাতি ঢালিয়ে রাখি। ফ্যান চালাই। পানির ক্ষেত্রে খুলে রাখি। এতে বিদ্যুৎ অপচয় হয়। পানি নষ্ট হয়। অকারণে গ্যাসের চুলা ঢালিয়ে রাখি। মনে করি যে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি বেঁচে গেল। কিন্তু এতে প্রচুর গ্যাস অপচয় হলো।

আমাদের মধ্যে অনেকে বাজি পোড়ায়। পটকা ফেটায়। এসব অপচয়। অনেকে বিড়ি, সিগারেট খায়। এগুলো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এগুলো খেলে ক্যালোর হয়। টাকা-পয়সার অপচয় হয়। অনেকে দুর্ঘাতি করে খড়কুটায় আগুন দেয়। এতে অনেক সময় বিপদ ঘটে। ঘরে আগুন লাগে। দোকানে আগুন লাগে। এ সবকিছুই অপচয়।

আমরা কোনো কিছু অপচয় করব না। আমরা প্রয়োজনের বেশি কিছু করব না। নেব না। নষ্ট করব না। অপব্যয় করব না। অপচয় করা থেকে বিরত থাকব। তাহলে কম ধরচ হবে। অভাব দূর হবে। সুখ-শান্তি থাকবে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা পাবে। আঞ্চলিক খুশি হবেন।

আমরা কোনো ছিনিস নষ্ট করব না,
অগচ্য করব না, যথাযথ ব্যবহার করব।
ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব
আল্লাহর মুক্ত্য মেলে চলব।

পরিবর্তিত কাজ: শিক্ষার্থীরা অপচয়মূলক কাজের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পরনিষ্ঠা না করা (تَرْكُ الْغِيْبَةِ)

পরনিষ্ঠা করা অর্থ শিবত করা, পরচর্চা করা, দুর্নাম রাঁটানো। কারণ অনুগম্ভিত্তিতে তার দোষের কথা বলার নাম শিবত বা পরনিষ্ঠা।

যে পরনিষ্ঠা করে তাকে পরনিষ্ঠুক বলে। পরনিষ্ঠা করা হ্যাম। মহান আল্লাহ পরনিষ্ঠা করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তাহালা বলেন, “তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না।”

আল্লাহ তাহালা পরনিষ্ঠা করাকে মৃত ভাইয়ের পোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। কোনো ভাই তার মৃত ভাইয়ের পোশত কখনো খেতে পারে না। এটা জব্যাতম অপরাধ। এটা মহাপাপ।

পরনিষ্ঠুক মহাপাপী। সে সমাজে শান্তি নষ্ট করে। আল্লাহ তাকে ঘূঁপা করেন, ভালোবাসেন না। যে ব্যক্তি পরনিষ্ঠা বা শিবত করে সে জালাতে খেতে পারবে না।

মহানবি (স) বলেন, “পরনিষ্ঠাকারী জালাতে প্রবেশ করবে না।”

পরনিষ্ঠা না করা সুন্দর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। পরনিষ্ঠার কারণে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঝেহ, মমতা, ভালোবাসা, সম্মান, প্রশংসা লোগ পায়। শান্তি নষ্ট হয়।

আমরা পরনিষ্ঠা বা শিবত করব না। কারণ কুসুম রাঁটাব না। কারণ দুর্নাম করব না। অগবাদ দেব না। পরনিষ্ঠা থেকে বিরত থাকব। তাহলে আমাদের মাঝে অশান্তি থাকবে না। আমাদের মাঝে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। একটি সুন্দর সুখী সমাজ গড়ে উঠবে। আল্লাহ খুশি হবেন। দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত লাভ করব। পরকালে জালাতের অনন্ত সুখ-শান্তি তোগ করব।

আমরা—

পরিনিষ্ঠা করব না, পরিনিষ্ঠা শুনব না।
সুন্দর জীবন গড়ব, সুন্দর সমাজ গড়ব।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দাও।

১) সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে কী বলে?

ক. মুনাজাত

খ. আখলাক

গ. ইবাদত

ঘ. সালাত

২) সচরিত্র কোনটি?

ক. পরিনিষ্ঠা করা

খ. লোভ করা

গ. মিথ্যা বলা

ঘ. সত্য কথা বলা

৩) সত্যিকার মুমিনের চরিত্র কেমন?

ক. সুন্দর

খ. অসুন্দর

গ. মিথুক

ঘ. অসৎ

৪) বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমরা কী করব?

ক. শরীর ভালো রাখব

খ. ভালো জামাকাপড় পরব

গ. আবৰা-আম্বাকে সালাম দেব

ঘ. চিন্তা করব

৫) অসৎ চরিত্র কোনটি?

ক. রোগীর সেবা করা

খ. শিক্ষককে সম্মান না করা

গ. ইবাদত করা

ঘ. শিক্ষককে সম্মান করা

১৪) যে ওয়াদা পালন করে, সকলে তাকে কী করে?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. অসম্মান করে | খ. ঘৃণা করে |
| গ. অবিশ্বাস করে | ঘ. বিশ্বাস করে |

১৫) “যত পায় আরও চায়”-এর নাম কী ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. লোভ | খ. অপচয় |
| গ. শান্তি | ঘ. ভালোবাসা |

১৬) পরনিন্দা করা অর্থ কী ?

- | | |
|----------------|------------------|
| ক. পরোপকার | খ. সাহায্য করা |
| গ. পরচর্চা করা | ঘ. সহযোগিতা করা। |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্রকে চরিত্র বলা হয়।
২. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের।
৩. যাঁরা বয়সে আমরা তাঁদের সালাম দেব।
৪. লোভ আমাদের অনেক করে।
৫. আমরা কোনো কিছু করব না।

গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
চরিত্র ভালো হলে	চলতে শেখান
আবো-আমার সাথে সুন্দর	ফেলব না
শিক্ষক সৎ ও ন্যায়ের পথে	জীবন সুন্দর হয়
যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা	তার ধর্ম নেই
যে ওয়াদা পালন করে না	ব্যবহার কর

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. আমাদের মহানবি (স)-এর চরিত্র কেমন ছিল ?
২. আবো-আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব ?
৩. শিক্ষকের সাথে দেখা হলে কী করব ?
৪. দাদা-দাদি ও নানা-নানি আমাদের কী করেন ?

৫. মহানবি (স) বড়দের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন ?
৬. মহানবি (স) ছোটদের কী করতেন ?
৭. আমরা কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করব ?
৮. প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে আমরা কী করব ?
৯. আমরা রোগীর কী করব ?
১০. সত্যবাদী কাকে বলে ?
১১. সব পাপের মূল কোনটি ?
১২. ওয়াদা পালন করা অর্থ কী ?
১৩. যে লোভ করে তাকে কী বলে ?
১৪. অপচয় অর্থ কী ?
১৫. কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম কী ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. সচরিত্রি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
২. আবা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহারের তালিকা তৈরি কর ।
৩. আবা-আম্মার জন্য কুরআন মজিদে বর্ণিত দোয়াটি আরবিতে লেখ ।
৪. বড়দের সাথে আমাদের কেমন ব্যবহার করা উচিত ?
৫. শিক্ষক আমাদের কী কী শেখান ?
৬. প্রতিবেশী কারা ? আমরা প্রতিবেশীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব ?
৭. ফুয়াদের আম্মার জ্বর হলে ফুয়াদ কী করেছিল ?
৮. সত্যবাদীর প্রতি মানুষের ধারণা কেমন ?
৯. ওয়াদা পালন করার উপকারিতা কী ?
১০. লোভ মানুষের কী কী ক্ষতি করে ?
১১. অপচয় থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা কী করব ?
১২. আল্লাহ পরিনিষ্ঠা না করার জন্য কী বলেছেন ?

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। সর্বশেষ আসমানি কিতাব। মহানবির (স) এর উপর নাজিল
হয় এ কিতাব।

আমাদের জন্য কুরআন মজিদে বলে দেয়া হয়েছে আমরা দুনিয়াতে কীভাবে শান্তিতে
বসবাস করব, কী কাজ করলে আখিরাতে শান্তি পাব, কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করব,
কোন কাজ অন্যায়, কোন কাজে শান্তি হবে এ সবকিছু কুরআন মজিদে আছে।

আমরা কুরআন মজিদ শুন্ধ করে শিখব। অপরকে শিখাব। কুরআন মজিদের নির্দেশমতো
চলব।

সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা ফরজ। তাই তিলাওয়াত শুন্ধ হওয়া দরকার।
মহানবি (স) বলেছেন, “**তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে
শিখায়”।**



কুরআন মজিদ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরআন মজিদ শিক্ষা সম্বন্ধে মহানবি (স) - এর বাণীটি
খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

আরবি বর্ণমালা

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আরবি পড়তে হয় ডান দিক থেকে। আরবিতে মোট ২৯টি হরফ বা অক্ষর আছে।

ج	ث	ت	ب	ا
জিম	ছা	তা	বা	আলিফ
ر	ذ	د	খ	হ
রা	ঘাল	দাল	খা	হা
ض	ص	ش	س	ঝ
দোয়াদ	সোয়াদ	শিন	সিন	ঘা
ف	غ	ع	ঝ	তোয়া
ফা	গাইন	আইন	যোয়া	তোয়া
م	م	ل	ك	কুফ
নূন	মীম	লাম	কাফ	কুফ
	ي	ه	ه	ওয়াও
	ইয়া	হাম্যা	হা	

আরবি হরফগুলোর নাম বলো :

ب	ش	د	ج	ا
ذ	ض	ز	خ	ه
ي	ت	ن	س	ر
ط	ص	ل	ف	ث
ك	ء	ق	ظ	ع
	ঘ	ঘ	ঝ	,

খালি হরফগুলোতে আরবি হরফ কসাও

ث				ا
ر			خ	
ض		ش		
	ঘ		ঝ	
ন		ل		ق
	ي		ঘ	

ক্রকত

আমরা জানি যবর ك যের ي এবং পেশ هـ -কে হরকত বলে। যেমন :

১। হজকের উপর যবর থাকলে উচাইলে ي -কার হবে। যথা :

أ - আলিফ যবর আ

بـ = বা যবর বা

تـ - তা যবর তা

আমরা এখন যবরসহ নিচের শব্দগুলো পড়ব। যথা :

نصر = নুন যবর না, সোয়াদ যবর সা, রা যবর রা = নাসরা

دَخْل	كَتَبَ	فَتَحَ	خَلَقَ	نَصَرَ
وَلَدَ	طَلَعَ	ذَكَرَ	طَلَبَ	فَعَلَ

২। ক্রকের নিচে যের থাকলে উচাইলে ي - কার হবে। যথা :

بـ - বা যের বি

تـ = তা যের তি

ثـ - সা যের সি

আমরা এখন যের সহ নিচের শব্দগুলো পড়ব। যথা:

إِذَا - লাম যের লি, মীম আলিফ যবর মা - লিমা

إِذَا	بِمَا	هِيَ	إِلَى	سَلِيمَ
شَهِدَ	سَبِعَ	عَلِمَ	رَجَمَ	

৩। আবের উপর পেশ থাকতে উচ্চারণে “ - কাম হবে। যথা :

- বা পেশ বু
- তা পেশ ছু
- সা পেশ সু

আমরা এখন পেশসহ নিচের শব্দগুলো পড়ব। যথা :

কৃতিব = কাক পেশ কু, তা বের তি, বা যবর বা = কুভিবা

হু	হুমা	কু	কুম	হুম
খুল্চ	জুম	নুস্র	নুস্ব	কুর্তুব
কুর্ম	বুদ্ধ	কুর্ব	হুস্ন	কুর্তুর

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা হয়ে কতবুক্ত আবাবি বর্ণগুলো আত্ম সূসন করে লিখবে।

তানবীন

দুই ববর ፻, দুই বের ፻, ও দুই পেশ ፻ -কে তানবীন বলে।

তানবীনের উচ্চারণ নূন্যত্ব হয়।

এবাব আমরা তানবীন সহ চাটটি পড়ব। যথা :

খ	ষ	ঠ	ঢ	অ
ৰ	ড	ঢ	খ	ঝ
ঢ	চ	শ	স	ঝ

ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
	ي	ء	ه	و

ج	ث	ت	ب	إ
د	ذ	ذ	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
	ي	ء	ه	و

ج	ث	ت	ب	أ
ر	ذ	د	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
	ي	ء	ة	و

জবম

আমরা জানি জবম এ যুক্ত হরফকে সাকিন বলে। যথা :

- آل** - আলিক শাম বৰুম আল।
- في** - ফা ইয়া দ্বের ফী।
- قل** - ক্লাফ শাম পেশ কূল।

জবম-এর আকৃতি সাথারপ্ত এ এঙ্গু হয়। তবে , এভাবেও দেখা হয়।

এবাব আমরা জবমযুক্ত হরফের চার্চটি পড়ো :

قُم	فِي	مِنْ	كُنْ	قُلْ
فَتْح	فِيلٌ	نَصْرٌ	حَمْدٌ	قَلْبٌ

এবার খালি হোকে জ্যম বসাও :

حَمْدٌ	قَوْلٌ	حَرْفٌ	فِعْلٌ	إِسْمٌ
--------	--------	--------	--------	--------

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা জ্যমযুক্ত আরবি কথেকষি শব্দ খাতায় সূচনা করে লিখবে।

তাশদীদ

একই হোক শাশগাশি দুবাই উচ্চারণ করাকে তাশদীদ বলে। তাশদীদের চিহ্ন ۴۵ এরূপ।
বেমন :

أَنْ + نَ = أَنْ	- আলিফ নূন যবর আন, নূন যবর না - আন্না
رَبْ + بَ = رَبَّ	- রা বা যবর রাব, বা যবর বা - রাববা

এবার আমরা তাশদীদসহ চারটি পড়ব:

رَبَّ	ثُمَّ	مَسَّ	حَقَّ	أَنَّ
رَبْ + بَ	ثُمْ + مَ	مَسْ + سَ	حَقْ + قَ	أَنْ + نَ

এবার এপুলো দেখ এবং খালি হোকে হোকতসহ তাশদীদ বসাও :

ثُمْ + مَ	حَقْ + قَ	أَنْ + نَ	أَبْ + بَ	رَبْ + بَ
ثُم	حَق	أَن	أَب	رَب

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা তাশদীদযুক্ত পাঠটি শব্দ খাতায় সূচনা করে লিখবে।

মাল

কুরআন মজিদের কোনো কোনো হজার টেনে পড়তে হয়। এই টেনে পড়াকে মাল বলে।

বর্ণা : **حَمْدَ اللّٰهِ**

মাল—এর হজার তিসটি। বর্ণা : **أَوْ - هِ**

১। যত্ন—এর পত্র | আশিয় থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। বর্ণা :

- مَادَا - মা-বা

- قَالَ - কা-লা,

২। দের—এর পত্র অবস্থুত **ي** ইয়া থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। বর্ণা :

قَيْلَ - কী-লা.

فِنَّهَا - ফী-হা,

৩। সেশ—এর পত্র অবস্থুত **فُ** ড্রাও থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। বর্ণা :

فُولُوا - ফু-লু,

صُومُوا - সু-মু,

আবর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাল—এর অন্য দুটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বর্ণা :

১। হেটি মাল = ~

২। কফ মাল = ~

যে জায়ের উপর ~ অনুপ চিহ্ন থাকে সে জ্ঞানটিকে একটু টেনে পড়তে হয়। বর্ণা :

إِيمًا. وَمَا. الَّذِي. لَا أَغْبَدُ

যে জায়ের উপর ~ অনুপ চিহ্ন থাকে সে জ্ঞানটিকে আলাদ যেশি টেনে পড়তে হয়।

বর্ণা : **ـ ت . ص . عَصْق . أُولَئِكَ . ضَالُّونَ**

মাদ্দ-এর আবাবত কিছু চিহ্ন আছে। যেমন :

১। খাড়া ঘবর ।

কোনো ক্ষয়ক্ষেত্রে উপর । এবুগ চিহ্ন থাকলে সে ক্ষয়ক্ষিতিকে একটু টেনে পড়তে হয়।

যথা: طَهٌ = তোরা খাড়া ঘবর তোরা, হা খাড়া ঘবর হা = তোরা-হা

এবাব খাড়া ঘবরমূলক ক্ষয়ক্ষিতি শব্দ পড়ব।

أَمْنٌ . ذِلْكَ . عَلٰى . بَلٍ . أَدَمٌ .

২। বের ।

কোনো ক্ষয়ক্ষেত্রে নিচে । এবুগ চিহ্ন থাকলে সে ক্ষয়ক্ষিতিকে একটু টেনে পড়তে হয়।

যথা: بِرٌ = বা বের বি, হা খাড়া বের হী = বিহী

এবাব খাড়া বেরমূলক ক্ষয়ক্ষিতি শব্দ পড়ব:

أَمْرٌ . حَمْرٌ . فَضْلٌ . صِفَاتٌ . أَهْلٌ .

৩। উচ্চ পেশ ।

আমরা জানি পেশ । এবুগ। কবে উচ্চ পেশ লেখা হয় । এভাবে।

কোনো ক্ষয়ক্ষেত্রে উচ্চ পেশ থাকলে সে ক্ষয়ক্ষিতি একটু টেনে পড়তে হয়। যথা:

لَهُ = সাম ঘবর লা, হা উচ্চ পেশ হু = লাহু।

এবাব উচ্চ পেশমূলক ক্ষয়ক্ষিতি শব্দ পড়ব:

إِنَّهُ . مَعَهُ . نَفْسَهُ . رَسُولُهُ . رَحْمَةُهُ

শিখের শব্দগুলো পড়ি:

. قَ . كُتُبُهُ . لَا . مَعَهُ .

ভাজবীদ (تَجْوِيد)

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আমাদেরকে আরবি ভাষা শিখতে হবে। আমরা আরবি হরফের সঠিক উচ্চারণ শিখব। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা প্রয়োজন। এতে অর্থ ঠিক থাকে। সালাত শুধু হয়। আল্লাহ গাক খুশি হন। আর সঠিক উচ্চারণে তিলাওয়াত না করলে অর্থ ঠিক থাকে না। সালাতও শুধু হয় না।

কুরআন মজিদ শুধুভাবে তিলাওয়াতের জন্য যে নিয়ম রয়েছে তাকে ভাজবীদ বলে।

মহানবি (স) বলেছেন, “কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফের জন্য ১০টি সালাত পাওয়া যায়।”

মাখরাজ (مَخْرُجْ)

আরবি হরফ মুখের বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন, কঠনালি, জিহ্বা, ডালু, দাত ও টোট।

হরক উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। আরবি হরফের মাখরাজ ১৭টি। এ সমস্কে আমরা বড় হলে জানতে পারব।

ইদগাম (إِعْدَادٍ)

কাছাকাছি উচ্চারণের দুটি হরফকে সূক্ষ্ম করে পড়াকে ইদগাম বলে। যথা:

فَهُمْ مُسْلِمُونَ – ফাত্তম মুসলিমুন। এখানে মীম **و** হরফটি প্রবর্তী মীম-এর সাথে ইদগাম হয়েছে।

مِنْ رَبِّ = মির রাবি। এখানে নূন **و** হরফটি প্রবর্তী রা **و** -এর সাথে ইদগাম হয়েছে।

مِنْ مُشْلِحٍ = মীম মিসলিঙ্গী। এখানে নূন হরফটি প্রবর্তী মীম-এর সাথে ইদগাম হয়েছে।

আমরা এখন নিম্নের শব্দগুলো ইদলামসহ পড়ব।

غَفُورٌ رَّحِيمٌ গোকুল রাহীম	مِنْ مَرْقَدِنَا মিম মারকাদীনা	مَنْ يَقُولُ মাইজাকুল
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ওয়ালাম ইয়াকুল	إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ইল কুন্তুম মুমিনীন	مِنْ رِزْقِ মিরাজিয়াকিল

ইথার - اظہار

ইথার শব্দের অর্থ থেকাণ করা। বর্ণে বা হরকের মাধ্যমে অনুযায়ী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা। নূন সাকিল এবং তানবীন-এর পর যদি হরকে হালকির থেকোনো একটি হরফ থাকে তখন নূন সাকিল বা তানবীনকে গুরুত্ব ও ইথকা ছাড়া নিজ মাধ্যমে অনুসারে স্পষ্ট করে পড়াকে ইথার বলে।

হরকে হালকি ৬ টি। যথা : غ-ع-خ-ح-م-س

مِنْ حَوْفٍ . عَذَابٌ أَلِيمٌ . مَنْ هُوْ . مِنْ عَلَيْقِ . عَلِيِّمٌ حَكِيمٌ . عَلِيِّمٌ حَبِيبٌ .

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ইথারের উচ্চারণের একটি চার্ট তৈরি করবে।

আরবি বর্ণের শব্দ

নিচে ৪টি চার্ট দেয়া হলো। এগুলো সঠিক উচ্চারণে পড় :

চার্ট ১

مَلِك	خَلَقَ	كَادَ	قَادَ	كَصَدَ	قَصَدَ
نَسْرٌ	نَصْرٌ	فَلَقٌ	فَلَكٌ	حَرْبٌ	هَرْبٌ



চার্ট-২

চার বর্ণের শব্দ

سَرِيرٌ	شَرِيرٌ	الْيَمِّ	عَلِيمٌ	بَصِيرٌ	بَشِيرٌ
أَكْبَرٌ	أَقْرَبٌ	صُورَةٌ	سُورَةٌ	زَمِيلٌ	جَمِيلٌ

চার্ট-৩

শাচ বর্ণের শব্দ

تَصْفِيدٌ	تَضْوِيرٌ	تَكْرِيرٌ	تَقْرِيرٌ	مَشْكُورٌ	مَذْكُورٌ
أَشْفِيدٌ	تَشْرِيبٌ	تَكْرِيمٌ	تَقْدِيمٌ	تَخْرِيمٌ	تَكْبِيرٌ

চার্ট-৪

ছয় বর্ণের শব্দ

يَاكُونَ	يَقُولُونَ	يَذْكُرُونَ	يَشْكُرُونَ	مُفْلِحُونَ	مُسْلِمُونَ
مُكَالَةٌ	مُقاَلَةٌ	مُجْرِمُونَ	مُحسِنُونَ	يَنْظُرُونَ	يَنْصُرُونَ

সূরা আন নাসর

মাদানি, আয়াত- ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

إِذَا جَاءَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ[۪] إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا[۫]

বাংলা উচ্চারণ

ইয়া জাও নাসরুল্লাহি ওয়ালফাতহু। ওয়ারাওয়াইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাবিহ বিহামদি রাবিকা ওয়াসতাগফিরহু। ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা।

অর্থ : ১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।

২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা কর, তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা সূরা আন নাসর বাংলা উচ্চারণে লিখবে।

সূরা আল লাহাব

মক্কি, আয়াত- ৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

تَبَّثْ يَدَ آءِي لَهَبٍ وَّتَبَّ . مَا آغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ . سَيَقْصُلُ نَارًا ذَاهَبًا
لَهَبٍ . وَامْرَأُهُ[۪] حَيَّالَةُ الْحَطَبِ[۫] . فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ[۬] .

বাংলা উচ্চারণ

তাৰকাত ইয়াদা আবি লাহাবিঁও ওয়াতাবো। মা আগনা আনহু মালুহু ওমাকাসাব। সাইয়াসলা
নারান যাতা লাহাবিঁও ওয়ামরাতুহু, হাম্মালাতাল হাতাব। ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থ : ১. ধৰ্ষস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধৰ্ষস হোক সে নিজেও।

২. এৱ ধন-সম্পদ ও এৱ উপার্জন তাৱ কোনো কাজে আসে নি।

৩. অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে,

৪. এবং তাৱ ঝৌও- যে ইন্ধন বহন কৱে,

৫. তাৱ গলদেশে পাকানো রঞ্জু।

সূরা ইখলাস

মৰ্কি, আয়াত-৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝

وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ ۝

বাংলা উচ্চারণ

কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ; ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়ালাম
ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

অর্থ : ১. বলো, তিনি আল্লাহ, একক।

২. আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।

৩. তাঁৱ কোনো সত্তান নাই এবং তিনি কারও সত্তান নন।

৪. এবং তাঁৱ সমতুল্য কেউ নাই।

অনুশীলনী

নৈর্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহু নির্বাচনি:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দাও :

১. কুরআন মজিদ কার কালাম ?

ক) মহানবি (স)-এর কালাম

গ) ফেরেশতার কালাম

খ) আল্লাহ তায়ালার কালাম

ঘ) মানুষের কালাম।

২. হযরত মুহাম্মদ(স)-এর উপর কোন কিতাব নাজিল হয়েছিল ?

ক) ইনজিল

খ) তাওরাত

গ) যাবুর

ঘ) কুরআন মজিদ।

৩. মাদ-এর হরফ কয়টি ?

ক) তিনটি

খ) চারটি

গ) পাঁচটি

ঘ) ছয়টি।

৪. হরফে হালকি কয়টি ?

ক) পাঁচটি

খ) ছয়টি

গ) সাতটি

ঘ) আটটি।

৫. ইদগাম-এর হরফ কয়টি ?

ক) তিনটি

খ) চারটি

গ) পাঁচটি

ঘ) ছয়টি।

৬. আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি ?

ক) ১১টি

খ) ১৩টি

গ) ১৭টি

ঘ) ১৯টি।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কুরআন মজিদ কালাম।

২. হরফ উচ্চারণের স্থানকে বলে।

৩. কুরআন মজিদের আরবি।

প. কৃত পিকেজ শব্দের সাথে তাম পিকেজ টিহেজ পিল কর :

১. বক্র	—
২. মের	—
৩. পেণ	—
৪. জব্য	>
৫. তাখলীদ	—
৬. তানবীন	ঢ

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন :

১. আম্বাবি হয়েক করাচি ?
২. হজুকত করাচি ?
৩. মাহের হয়েক করাচি ?
৪. হয়েকে হজুকি করাচি ?
৫. সাকিস কাকে বলো ?

বৰ্ণালুক উত্তরের জন্য প্রশ্ন :

১. কুন্নাইন মজিল তিলাওয়াত সমষ্টকে মহানবি (স)–এর বাণীটি লেখ।
২. হজুকত কাকে বলো ? উদাহরণ দাও।
৩. তানবীন কাকে বলো ? একটি করে উদাহরণ দাও।
৪. জব্য কাকে বলো ? উদাহরণ দাও।
৫. মাহে কাকে বলো ? মাহে–এর হয়েক করাচি ? উদাহরণ দাও।
৬. তাখলীদ কাকে বলো ?
৭. মাখলাজ কাকে বলো ? মাখলাজ করাচি ?
৮. ইসগাম কাকে বলো ? উদাহরণ দাও।
৯. তিন, চার, পাঁচ ও হাত বার্গের একটি করে শব্দ লেখ।
১০. সুন্না আন নাসর মুখস্থ বলো।
১১. সুন্না ইখলাজ মুখস্থ বলো।

পঞ্চম অধ্যায়

নবি ও রাসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসেন। তাঁর ইচ্ছায় আমরা সুন্দর জীবন গড়ে তুলব। দুনিয়াতে সুখ-শান্তি পাব। আখিরাতে জান্নাত লাভ করব। জান্নাতে রয়েছে চরম শান্তি ও পরম আনন্দ।

কীভাবে আমরা সুন্দর জীবন গড়ে তুলব। কোন পথে চললে আল্লাহ খুশি হবেন? কী কাজ করলে দুনিয়াতে সুখে বসবাস করব ও শান্তিতে থাকব? এসবের সম্বান্ধে পেয়েছি আমরা নবি-রাসুলের মাধ্যমে। নবি-রাসুল আমাদের শিক্ষক। তাঁরা আমাদের আল্লাহর ইবাদত করার নিয়মকানুন শিখিয়েছেন। সঠিক পথে জীবনযাপন করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। কুরআন মজিদে ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে হ্যরত আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ এবং প্রথম নবি। আর আমাদের মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাতু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। এখন আমরা কয়েকজন নবি-রাসুলের জীবনাদর্শ জানব।

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ

জন্ম ও পরিচয়

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আক্বার নাম আব্দুল্লাহ। আমার নাম আমিনা। তাঁর দাদা আব্দুল মুভালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ (প্রশঠসিত)। আর আমা আমিনা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ (প্রশঠসাকারী)।

মহানবি(স) এর জন্মের আগেই তাঁর আক্বা ইন্তিকাল করেন। আর তাঁর ছয় বছর বয়সে আমা ইন্তিকাল করেন। বাবা-মা হারা ইয়াতীম শিশুকে তখন থেকে লালন-পালন করতে থাকেন তাঁর দাদা আব্দুল মুভালিব। দাদার ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মহানবি (স)-কে খুব আদর-স্নেহ করতেন।

তাঁর চরিত্র ছিল খুবই সুন্দর। শিশুকাল থেকেই তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন। মানুষের উপকার করতেন। বড়দের সম্মান করতেন। ছোটদের আদর করতেন। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। কাউকে গালি দিতেন না। কারও সাথে ঝগড়া করতেন না।

মারামারি করতেন না। হিংসা করতেন না। সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতেন।

সবাই তাঁকে ভালোবাসত। আদর করত। সম্মান করত। বিশ্বাস করত। আল-আমিন বলে ডাকত। আল-আমিন অর্থ বিশ্বাসী। মহানবি (স) এর মতো আমরা –

সত্যকথা বলব, মানুষের উপকার করব,
বড়দের সম্মান করব, ছোটদের আদর করব,
সকলকে ভালোবাসব, বিশ্বাস করব,
তাহলে মহানবি (স) আমাদের ভালোবাসবেন, আল্লাহ ভালোবাসবেন।

হিলফুল ফুজুল গঠন

মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই অপরের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। শিশু অবস্থায়ই তিনি অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করতেন। তাঁর দুধমা হালিমার একটি পুত্র সন্তান ছিল। তিনি তাঁর দুধমার একটি স্তনের দুধ নিজে পান করতেন এবং অন্য স্তনের দুধ তাঁর দুধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অপরের দুঃখে দুঃখ পেতেন। অন্যের কষ্টে কষ্ট পেতেন, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতেন।

তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। কারও কোনো অসুবিধা হলে তা দূর করার চেষ্টা করতেন। অসহায় ও নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করতেন। সাধ্যমতো মানুষের সেবা করতেন।

জুয়াখেলা মারাত্মক অপরাধ। এতে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়। শত্রুতা বাঢ়ে। অনেক কলহ ও মারামারি হয়। যুদ্ধবিহু ঘটে। একদা আরবদেশে ওকায় মেলায় জুয়াখেলাকে বেসন্ত করে কুরাইশ ও কারয়েস বংশের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল। অনেক লোক এ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। মহানবি (স) নিজে তাঁর চাচা যুবায়ের (রা)-এর সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শত্রুদের নিষ্কিন্ত তীরগুলো সংগ্রহ করে

চাচার হাতে তুলে দিতেন। এটি ‘হারবুল ফিজার’ (حَرْبُ الْفِيْجَار) বা ‘অন্যায় সমর’ নামে পরিচিত। এ ভয়াবহ যুদ্ধের দৃশ্য দেখে মহানবি (স)-এর প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি চিন্তা করলেন, কীভাবে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়? কীভাবে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায়? অসহায়দের সাহায্য করা যায়? এজন্য তিনি কয়েকজন উৎসাহী যুবককে সাথে নিয়ে একটি সেবাসংঘ গঠন করেন। আর এই সংঘের নাম রাখেন

হিলফুল ফুজুল (جَلْفُ الْفَضْلُ) বা শান্তিসংরক্ষণ। এই সংবেদের মাধ্যমে তিনি দুঃখী ও অসহায় মানুষদের দুঃখ-কষ্ট সূর করার চেষ্টা করেন। সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে। তখন মহানবি (স) এর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। এ সংব প্রায় ৫০ বছর স্থায়ী ছিল।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা ‘হিলফুল ফুজুল’ – এর নীতিগুলো খাতায় লিখবে।

নবুরত শান্ত

মহানবি হৃবরত মুহাম্মদ (স) সমাজের দুরাক্ষ্যা দেখে দুঃখ পেতেন। কষ্ট পেতেন। মানুষের নৈতিক অধঃগতন তাঁকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। বয়স বাঢ়ার সাথে সাথে তাঁর চিন্তাভাবনাও বাঢ়তে থাকে। তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে ‘হেরো’ নামক পর্বতের নির্জন গুহায় আশ্রাহুর থ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর মনে নানা চিন্তা ও প্রশ্ন জাগত। তিনি ভাবতেন আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি? আবার কোথায় যাব?



হেরোগুহা: আমাদের প্রিয় নবি (স) এই গুহায় থ্যানমগ্ন থাকতেন।

এই পৃথিবী সূচির কী উদ্দেশ্য ? মানুষ এত ঘারামারি, কাটাকাটি কেন করে ইত্যাদি।

এভাবে মহানবি (স)-এর ধ্যান ও ইবাদত চলতে থাকল। তাঁর বয়স ৪০ বছর হলো।
রম্যান মাসের কদর রাত। মহানবি (স) হেরাগুহায় ধ্যানরত। চারদিক নীরব, নিবৃত্ত।
এমন সময় ঔধার গুহা আলোকিত হয়ে উঠল। আল্লাহর নির্দেশে কেরেশতা জিবরাইল
(আ) আল্লাহর মহান বাণী সর্বপ্রথম নিয়ে আসলেন। তিনি মহানবি (স)-কে সজ্ঞ করে বললেন,
إِنَّمَا (ইকুরা-পড়ুন)। পড়তে বললেন, কুরআন মজিদের সূরা আলাকের প্রথম তৃতী আয়াত।

সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতের অর্থ:

- ক) (হে মুহাম্মদ !) পাঠ করুন, আপনার সেই প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
- খ) যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত (আলাক) থেকে।
- গ) পাঠ করুন আপনার সেই মহিমাহীত প্রতিপালকের,
- ঘ) যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।
- ঙ) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

এভাবে তিনি ৪০ বছর বয়সে নবৃত্ত লাভ করলেন।

পরিকল্পিত কার্য : শিক্ষার্থীরা সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতের অর্থ খাতায় লিখবে।

মুকাম ইসলাম প্রচার

মহানবি (স) নবৃত্ত লাভের পর আল্লাহর তাওহিদ (একত্ববাদ) প্রচার করতে থাকলেন।
তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। তিনি প্রথম তিন বছর আজীব-জজন ও নিকটতম লোকদের
কাছে পোপনে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর জী হ্যন্ত খাদিজা (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম প্রহণ
করেন। অতঃপর পুরুষদের মধ্যে হ্যন্ত আবু বকর (রা) এবং বালকদের মধ্যে হ্যন্ত
আলী (রা) ইসলাম প্রহণ করেন। প্রথম তিন বছরে ৪৫ জন নরনারী ইসলাম প্রহণ করেন।

অতঃপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। অনেকেই ইসলামের
সুন্নীতি ছাপায় আশ্রয় নিতে থাকলেন। কিন্তু কুরাইশ বংশের অনেক নেতা তাঁর কথা
মানল না। তারা মহানবি (স)-এর ঘোর শক্তি হলো। মহানবি (স)-এর উপর ঝেগে পেল। তাঁর
উপর অত্যাচার শুরু করল। তাঁর চাচা আবু লাহাব তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারল। রক্তাক্ত করল।

কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলতে লাগল। তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু হলো। তাঁর মাথার উপর ময়লা-আবর্জনা রাখল। চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিল। তাঁর অনুসারীদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করল। এভাবে তারা মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ইসলাম প্রচারে বাধা দিতে থাকল।

মহানবির (স) আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাস ছিল। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি সব অত্যাচার সহ্য করলেন। সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি ইসলাম প্রচার করলেন।

পরিকল্পিত কাজ : মকায় ইসলাম প্রচারে মহানবি (স) যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

শ্রমের মর্যাদা দান

শ্রম মানে কাজ করা, পরিশ্রম করা। আমাদের মহানবি (স) সবসময় নিজের কাজ নিজেই করতেন। তিনি কখনো কাজ ফেলে রাখতেন না। কাজে অবহেলা করতেন না। নিজে কাজ করতেন। অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

আমরা অনেক সময় কাজ করতে গেলে লজ্জা পাই। মনে করি যে, কাজ করলে লোকে আমাকে কাজের লোক বলবে। চাকর বলবে। ঘৃণা করবে। অসম্মান করবে। কিন্তু এ রকম মনে করা ঠিক না। বরং কাজ করলে সকলে তাকে ভালোবাসে। শুন্দৰ করে। স্নেহ করে। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। মর্যাদা দান করেন।

মহানবি (স) ছেঁড়া জামাকাপড় নিজ হাতে সেলাই করতেন। জুতা মেরামত করতেন। জামা-কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন। মেহমানকে নিজে খাওয়াতেন। সেবাযন্ত্র করতেন। তিনি পরিবারের অন্যদের সাথে কাজ করতেন। সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। কাজকে ঘৃণা করতেন না।

একটি ঘটনা: একদিন মহানবি (স) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পেলেন যে, এক বৃক্ষ লোক বাগানে পানি দিচ্ছে। পানি ছিল বাগান থেকে অনেক দূরে। বৃক্ষ লোকটির পানি আনতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। লোকটি ছিল চাকর। মহানবির (স) দয়া হলো। তিনি লোকটির কষ্ট দেখে এগিয়ে গেলেন। বৃক্ষের হাত থেকে পানির পাত্রটা নিজের হাতে নিয়ে বাগানে পানি দিলেন। বৃক্ষ লোকটি মহানবির (স) উপর খুব খুশি হলেন।

মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে বলেছেন, “যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই। তাদের

কষ্ট দেবে না। মর্যাদা দেবে। নিজে যা খাবে তাদের তা খাওয়াবে। নিজে যা পরবে তাদের তা পরাবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে।”

তিনি আরও বলেন, “শ্রমিককে তার গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।”

আমাদের বাসাবাড়িতে গরিব লোকজন ও মহিলারা নানারকম কাজকর্ম করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাজকর্ম করে থাকে। আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। কাজের লোকজন বয়সে বড় হলে তাদের সম্মান করব। বয়সে ছোট হলে আদর-স্নেহ করব। নিজেরা যা খাব তাদেরও তাই খেতে দেব। মাত্রাতিরিক্ত কাজ দেব না। তাদের কাজে সাহায্য করব। তাদের কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তারা আমাদের মতো মানুষ। তারা আমাদের তাই। আমাদের মতো তাদেরও মর্যাদা আছে। আমরা তাদের মর্যাদা দেব। তাদের শ্রমের মর্যাদা দেব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)-এর শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে ৫টি বাক্য লিখবে।

মহানবি (স)-এর দয়া

মহানবি (স) ছিলেন দয়ার উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি মানুষ, পশুপাখি ও গাছপালা সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। কেউ ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য দিতেন। অসুস্থ হলে তার খোঁজখবর নিতেন। সেবাযত্ত করতেন। গরিব, ভিক্ষুক, ইয়াতীম ও অসহায়দের প্রতি দয়া দেখাতেন।

একদা মহানবি (স) সাহাবিদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় এক ইয়াতীম বালক মহানবির (স) কাছে আসলো। গায়ে তার জামাকাপড় নাই। দুঃখকষ্ট সহিতে সহিতে তার বুকের হাড়গুলো বের হয়ে গেছে। বালকটি কাঁদতে কাঁদতে মহানবিকে (স) বলল, আমার আবু নাই। আবু জাহল আমাদের সম্পদ কেড়ে নিয়েছে। তার কাছে সম্পদের কিছু চাইলে সে আমাকে মারধর করে, অত্যাচার করে, তাড়িয়ে দেয়। বালকটির কথা শুনে মহানবির (স) মনে দয়া হলো। তাঁর চোখে পানি এলো। তিনি বালকটিকে নিয়ে আবু জাহলের কাছে গেলেন। বালকটির সব পাওনা আবু জাহলের কাছ থেকে আদায় করে দিলেন। ইয়াতীম বালকটি খুব খুশি হলো।

তিনি শুধু মানুষের প্রতি দয়া দেখান নি, বরং আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখায় আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। তাদের প্রতি খুশি হন।

মহানবি (স) বলেছেন, “পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন।”

আমরা দয়া দেখাব-

ইয়াতীম , অসহায়দের প্রতি ,
পশুপাখি ও গাছপালার প্রতি ,
সকল মানুষের প্রতি ,
আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি ।

মহানবি (স)-এর ক্ষমা

মহানবি (স) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত্প্রতীক। তিনি শত্রু-মিত্র সবাইকে ক্ষমা করতেন। তিনি ঠার চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও প্রতিশোধ নেন নি। তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

একটি ঘটনা: মহানবি (স) গাতফানের যুদ্ধ শেষ করে বাড়িতে ফিরছেন। এক কাফির ঠার কাছে আসলো। সে একটি খোলা তলোয়ার মহানবি (স)-কে দেখিয়ে বলল, “হে মুহাম্মদ, তোমাকে এই তলোয়ারের আঘাত থেকে কে রক্ষা করবে?” মহানবি (স) নির্ভয়ে উভর দিলেন, “আল্লাহ”। কাফির উভর শুনে খুবই ভয় পেল। তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেল। তখন মহানবি (স) ঐ তলোয়ারটি হাতে তুলে নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, ‘ওহে, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?’ কাফির খুব ভয় পেল। মহানবি (স)-এর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স) সকল মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ঠার ক্ষমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)-এর ক্ষমা সম্বন্ধে ৫টি বাক্য লিখবে।

মহানবি (স)-এর মাতৃভক্তি

আবৰা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। বিশেষ করে আম্মা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেন। তিনি স্নেহ-মমতা ও দৰদ দিয়ে আমাদের লালনপালন করেন। আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী মায়ের ভক্তি করা একান্ত কর্তব্য।

মহানবির (স) বয়স যখন ৬ বছর তখন ঠার আম্মা আমিনা ইস্তিকাল করেন। তাই তিনি ঠার আম্মাকে সেবাযন্ত্র করার সুযোগ পান নি। কিন্তু ঠার দুধমা হয়রত হালিমা (রা) কে তিনি চরম ভক্তিশূন্ধা করতেন। সম্মান দিতেন।

একদিনের ঘটনা: আমাদের মহানবি (স) সাহাবিগণের সাথে বসে আছেন। সেখানে এক বৃক্ষ আসলেন। মহানবি (স) ঠাকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বৃক্ষকে সম্মান

করলেন। মর্যাদা দিলেন। নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন। খুব যত্নের সাথে বসালেন। সাহাবিগণ অবাক হলেন। তাঁরা মহানবিকে (স) জিজ্ঞাসা করলেন, “ইনি কে?” তিনি উত্তরে বললেন, “ ইনি আমার দুধমা হালিমা।”

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)-এর মাতৃভক্তি ঘটনাটি খাতায় লিখবে।

হযরত মূসা (আ)

হযরত মূসা (আ) ছিলেন একজন বিখ্যাত নবি। তাঁর পিতার নাম ইমরান। মাতার নাম ইউখাবেজ। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০৪০ অন্দে মিশরে বনি ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীনকালে মিশরের বাদশাহকে ফিরআউন বলা হতো। তাদের মধ্যে এক ফিরআউনের নাম ছিল ওলীদ। ওলীদ ছিল খুব লোভী। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজেকে উপাস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। সে তার মন্ত্রী ও বন্ধু হামানের পরামর্শে রাজ্যের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিল। জনগণ ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা ভুলে মুর্খে পরিণত হলো। সুযোগ বুঝে সে নিজেকে উপাস্য বলে ঘোষণা করল। কিবর্তী বংশ তার অনুগত ছিল, তারা তাকে পূজা করতে শুরু করল। কিন্তু বনি ইসরাইল বংশ তখনও হযরত ইউসূফ (আ) এর একত্বাদের ধর্ম মেনে চলত। তারা ফিরআউনকে খোদা বলতে সম্মত হলো না। ফিরআউন ও কিবর্তী বংশ বনি ইসরাইলদের উপর কঠিন নির্যাতন চালাতে লাগল। এরই মধ্যে ওলীদ স্বপ্নে দেখল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে এক ঝলক আগুন বের হয়ে এসে তার রাজপ্রাসাদসহ গ্রাস করছে। তার অনুসারী কিবর্তী বংশকেও জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বনি ইসরাইলগণ সম্পূর্ণ নিরাপদ। আগুন তাদের স্পর্শ করছে না। ফিরআউন রাজ্যের গণকদের ডেকে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল। বালআম বাউর নামে এক গণক বলল, “ইসরাইল বংশে একটি পুত্র শিশু জন্মগ্রহণ করবে। সে আপনার ও আপনার রাজত্বের ধ্বংসের কারণ হবে এবং কিবর্তী বংশ ধ্বংস হবে।” স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফিরআউন তার সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠল। সে রাজ্যময় সৈন্যদের পাহারা নিযুক্ত করল এবং জন্মগ্রহণকারী সকল ইসরাইলি শিশুপুত্রকে হত্যার নির্দেশ দিল। সৈন্যরা গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা তৈরি করল। আর জন্মগ্রহণকারী পুত্রসন্তানকে হত্যা করতে লাগল। এভাবে অসংখ্য ইসরাইলি শিশুপুত্র ফিরআউনের লোকদের হাতে নিহত হলো।

জন্ম

হযরত মূসা (আ)-এর মাতা গর্ভধারণ করেছিলেন। আল্লাহর কুদরতে ফিরআউনের লোকেরা তা বুঝতেই পারে নি। তাঁর জন্ম হলো। মা ফিরআউনের ভয়ে শিশু মূসাকে একটি

সিন্ধুকে ভরে আল্লাহর নির্দেশে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। আল্লাহর কুদরতে সিন্ধুকটি ভাসতে ভাসতে নদীর তীরবর্তী ফিরআউনের রাজপ্রাসাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়লো। ফুটফুটে মায়াভরা চেহারার শিশুটিকে দেখে ফিরআউনের স্ত্রী হ্যরত আছিয়া কোলে তুলে নিলেন। আছিয়া ছিলেন ইসরাইলি কন্যা। তিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন। ফিরআউন তাঁকে জোর করে বিয়ে করেছিল। শিশু মূসা (আ) অন্য কারও দুধ পান না করায় হ্যরত মূসা (আ)-এর বড়বোন মরিয়মের পরামর্শে মূসা (আ)-এর মাকেই ধাত্রী নিয়োগ করা হলো। আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে মূসা (আ) ফিরআউনের ঘরে, তারই অর্থব্যয়ে মায়ের কোলে লালিত পালিত হতে লাগলেন।

মাদইয়ান বা মাদয়ান গমন

একবার মূসা (আ) দেখতে পেলেন কিবতী বংশীয় ফিরআউনের এক বাবুর্চি এক ইসরাইলী কাঠুরিয়ার প্রতি অত্যাচার করছে। তিনি ইসরাইলিকে বাঁচাবার জন্য কিবতীকে একটি ঘৃষি মারলেন। এতে সে মারা যায়। পরের দিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। আর এক কিবতী আগের দিনের ইসরাইলির উপর অত্যাচার করছিল। মূসা (আ) এগিয়ে গেলে ইসরাইলী ভয় পেয়ে পূর্বদিনের ঘটনা বলে দেয়। কিবতী এসে ফিরআউনকে খবর দিল যে, কিবতীর হত্যাকারী মূসা (আ)। ফিরআউন মূসা (আ)-এর দণ্ড ঘোষণা করল। এ ঘটনা জানতে পেয়ে মূসা (আ) মিশর ছেড়ে লোহিত সাগরের পূর্বতীরে মাদয়ান চলে যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত নবি হ্যরত শুআইব (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। হ্যরত শুআইব (আ) মূসা (আ)-এর খেদমত, কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সফুরাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। সেখানে তিনি দশ বছর কাটান। এ সময় তিনি বকরিও চরিয়েছেন।

নবুয়ত লাভ

হ্যরত মূসা (আ) স্ত্রী সফুরা এবং খাদেম ও মেষ-বকরি পাল নিয়ে মায়ের সাথে দেখা করার জন্য মাদইয়ান থেকে মিশর যাত্রা করলেন। পথে আগুনের খুব প্রয়োজন ছিল। দূর থেকে আলো দেখে তিনি আগুনের খোঁজে তুর পাহাড়ের কাছে গেলেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশে ‘তুয়া’ নামক পবিত্র উপত্যকায় নবুয়ত লাভ করেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বললেন, “আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা আদেশ করা হয় তা শুনতে থাক ।”— সূরা ত্বাহা: ১৩

এ সময় আল্লাহ তায়ালা হ্যরত মূসা (আ)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন। এজন্য তিনি ‘কালিমুল্লাহ’ উপাধিতে ভূষিত হন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসাকে (আ) ফিরআউনের নিকট গিয়ে দীনের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত মুসা (আ) আল্লাহর কাছে তাঁর দুর্বলতা ও অসুবিধার কথা জানিয়ে দোয়া করলেন। তিনি যেন তাঁকে সাহস দেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাজ সহজ করে দেন এবং তার মুখের জড়তা দূর করে দেন। যাতে লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। তিনি তাঁর ভাই হারুন(আ) কেও সহযোগী হিসাবে চাইলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রার্থনা করুণ করলেন।

হযরত মুসা(আ) তাঁর ভাই হারুন(আ) কে নিয়ে ফিরআউনের কাছে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিলেন। তিনি আল্লাহর দেওয়া অলৌকিক ঘটনাও দেখালেন। কিন্তু ফিরআউন কিছুতেই ইমান আনল না। বরং সে হযরত মুসা (আ) কে হত্যা করার সংকল্প করল।

দলবলসহ ফিরআউনের ধর্ষণ

হযরত মুসা (আ) ফিরআউনের কুমতলব জানতে পেরে ইসরাইলিদের নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। সংবাদ পেয়ে ফিরআউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল। মুসা (আ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে নীলনদের তীরে উপস্থিত হলেন। সামনে নীলনদ ও পেছনে ফিরআউন বাহিনী।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত মুসা (আ) হাতের লাঠি দ্বারা নদীতে আঘাত করলেন। পানি দুই ধারে সরে গেল। বনি ইসরাইলের ১২টি দলের জন্য ১২টি রাস্তা হয়ে গেল। হযরত মুসা (আ) তাঁর লোকজনসহ নিরাপদে নদী পার হয়ে গেলেন। ফিরআউন নদীতে শুকনা রাস্তা দেখে সে রাস্তা ধরেই পার হতে লাগল। যেই না তারা নদীর মাঝখানে পৌছল, অমনি রাস্তা নদীর পানিতে মিলিয়ে গেল। ফিরআউন তার দলবলসহ ডুবে মরল। আল্লাহর নবিকে ধর্ষণ করতে গিয়ে নিজেই সদলবলে ধর্ষণ হলো।

হযরত মুসা (আ)-এর তাওরাত লাভ

হযরত মুসা (আ) আল্লাহর নির্দেশে তাওরাত কিতাব আনার জন্য তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে তিনি ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সামেরী নামক এক ব্যক্তির ধোকায় পড়ে অনুসারীদের অনেকেই গো-বৎস পূজায় জড়িয়ে পড়ল। হযরত মুসা (আ) তাওরাত নিয়ে ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে ভীষণ ক্ষুঢ় ও মর্মাহত হলেন। তওবা হিসাবে গো-বৎস পূজারিদের হত্যার নির্দেশ হলো। এতে সন্তুর হাজার বনি ইসরাইল নিহত হলো। হযরত মুসা (আ) ও হযরত হারুন (আ)-এর কানাকাটিতে অবশিষ্টদের ক্ষমা করা হলো। হযরত মুসা (আ) ১২০ বছর জীবিত ছিলেন।

হ্যরত হুদ (আ)

হ্যরত হুদ (আ) একজন নবি ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ‘আদ’ জাতির হিদায়েতের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। ‘আদ’ সম্প্রদায় এবং হুদ (আ)-এর বংশতালিকা চতুর্থ পুরুষে ‘সাম’ পর্যন্ত পৌছে মিলে যায়। তাই হুদ (আ) তাদের বংশগত ভাই। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাওত ও ইয়েমেন পর্যন্ত ‘আদজাতির’ বসতি ছিল। তারা যেমন ছিল শক্তিশালী তেমনি বিরাটাকায় সুস্থামদেহের অধিকারী ছিল। তারা অহংকারী ও অত্যাচারী ছিল।

আদজাতি এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মূর্তিপূজা ও নানারকম শিরকে লিপ্ত ছিল। হ্যরত হুদ (আ) তাদের শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন। জুনুম-অত্যাচার ত্যাগ করে ন্যায়নীতি ও সুবিচার করতে বলেন। তারা অহংকার করে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ অমান্য করল। হ্যরত হুদ (আ) তাদের আজাবের ভয় দেখান, কিন্তু তারা ভয় পেল না। আল্লাহর ইচ্ছায় প্রথমে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ এলো। এতেও তারা শোধরাল না। পরে তাদের উপর লাগাতার ৭ রাত ও ৮ দিন ভীষণ ঘূর্ণিঝড় চলল। এতে তাদের ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, গাছপালা ও লোকজন ধূলিসাং হয়ে গেল। গোটা এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হলো। অহংকার তাদের পতনের কারণ হলো। আজাবের সময় হ্যরত হুদ (আ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের কিছুই হলো না। আল্লাহ তাঁদের নিরাপদে রাখলেন। পরে তাঁরা মকাব চলে যান।

হ্যরত সালিহ (আ)

হাজার হাজার বছর আগে এ পৃথিবীতে ‘সামুদ’ নামে একটি জাতি বাস করত। এরা ছিল নৃহ (আ)-এর পুত্র ‘সাম’-এর বংশধর। এ জাতি আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বাস করত। এদের প্রধান শহর ছিল ‘হিজর’। বর্তমানে এটি মাদায়েনে সালিহ নামে পরিচিত।

আমরা আগেই জেনেছি এদের পূর্বে এখানে শক্তিশালী ‘আদজাতি’ বসবাস করত। তাদের হিদায়াতের জন্য তাদের কাছে হ্যরত হৃদকে (আ) পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য তাদের ধর্ষণ করে দেওয়া হয়েছিল।

সামুদজাতি ‘আদজাতির’ রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ হস্তগত করল। তারাও অর্থে-বিত্তে, শক্তিতে, বুদ্ধিতে সমৃদ্ধির অধিকারী হলো। এই জাতিও সম্পদ ও শক্তির অহংকারে আল্লাহকে ভুলে গেল।

আল্লাহ তায়ালা তাদের হিদায়াতের জন্য তাদেরই বংশের লোক হ্যরত সালিহ (আ)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি ‘সামুদ’ জাতিকে এক আল্লাহর উপর ইমান আনতে বললেন, তাঁর ইবাদত করতে বললেন। তারা আল্লাহর নবির কথা মানল না। তিনি তাদের আল্লাহর আজাবের সংবাদ দিলেন। তাতেও তারা ভয় পেল না। সালিহ (আ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ‘হিজর’ ত্যাগ করলেন। সামুদ জাতির উপর আল্লাহর আজাব এল। ভীষণ শব্দ ও ভূমিকঙ্গে তারা ধর্ষণ হয়ে গেল।

হ্যরত ইসহাক (আ)

হ্যরত ইসহাক (আ) ছিলেন প্রসিদ্ধ নবি হ্যরত ইবরাহীম (আ) এর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি হ্যরত ইসমাইল (আ)-এর ছোট ভাই। তাঁর মায়ের নাম হ্যরত সারা (আ)। বিখ্যাত নবি ইয়াকুব (আ) ছিলেন তাঁর পুত্র। তাঁর বংশে অনেক নবি-রাসূল জন্মগ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা হ্যরত লৃত (আ)-এর নাফরমান সম্প্রদায়কে ধর্ষণ করার জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁরা পথে ইবরাহীম (আ)-এর মেহমান হলেন। ইবরাহীম (আ) যথারীতি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু মেহমানদের আহারের ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখে বিস্তি হলেন। মেহমানরা বললেন, “আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। আমরা লৃত (আ)-এর পাপী সম্প্রদায়কে ধর্ষণের জন্য সামুদ যাচ্ছি।” তাঁরা এ সময় ইবরাহীম (আ) ও

তাঁর স্ত্রী সারা (আ)কে তাঁদের পুত্র ইসহাক (আ) এর জন্ম এবং নবি হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

ইসহাক (আ) তাঁর পিতা ইবরাহীম (আ) ও তাই ইসমাঈল (আ)-এর দীন প্রচার করতেন। তিনি বেশিরভাগ সময় ছিলেন শামের ফিলিস্তিনে।

তিনি ৪০ বছর বয়সে বিয়ে করেন। ৬০ বছর বয়সে তাঁর জময দুই সন্তান ঈসু ও ইয়াকুব (আ) জন্মগ্রহণ করে। তিনি ১৮৬ বছর বয়সে ইত্তিকাল করেন।

হ্যরত লৃত (আ)

হ্যরত লৃত (আ) একজন নবি ছিলেন। তিনি ছিলেন হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর তাই হারানের পুত্র। ছোটবেলাতেই লৃত (আ)-এর পিতা হারান মারা যান। তাই ইবরাহীম (আ) ভাইয়ের ইয়াতীম ছেলেকে নিজের পুত্রের মতোই লালনপালন করতেন এবং নিজের সঙ্গে রাখতেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান ছিল না। তিনি লৃত (আ)কে নিজের ওয়ারিস মনে করতেন। ইবরাহীম (আ)-এর উপর প্রথম ইমান এনেছিলেন হ্যরত সারা (আ) ও হ্যরত লৃত (আ)। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর সাথে হিজরতও করেছিলেন।

হ্যরত ইবরাহীম (আ) যখন কিনআনে ছিলেন তখন তিনি লৃত (আ)-কে সত্য দীন প্রচারের জন্য পূর্ব জর্দানের ‘সাদুম’ ও আমুরায় পাঠিয়েছিলেন। আরব, ফিলিস্তিন ও শামের মানচিত্রে দৃষ্টিগত করলে বর্তমান পূর্ব জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি বিখ্যাত ও বিশাল জলাশয় দেখা যায়। তাকে বলা হয় মৃতসাগর। তাকে লৃত সাগরও বলা হয়।



মৃতসাগর

সাদুম ছিল অত্যন্ত উর্বর ও সবুজ-সজীব এলাকা। সেখানেই তিনি বসতি নির্মাণ করেন। সেখানকার লোকেরা অতি বিলাসী জীবনযাপন করত। তারা পাপ, লজ্জাহীনতা ও নাফরমানির কাজগুলো গর্বের সাথে প্রকাশ্যে করে বেড়াত।

শূত (আ) তাদের হিদায়াতের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো ফল হলো না। তারা শূত (আ) ও তাঁর অনুসারীদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল। শূত (আ) তাদের বোঝালেন এবং আল্লাহর আজ্ঞাবের কথা শোনালেন। কিন্তু তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে

লাগল। লৃত (আ) আল্লাহর আদেশে অনুসরীদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর কাফির স্ত্রী রয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা আজাবস্বরূপ বিকট শব্দ ও পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং এলাকাটিকে উলিটিয়ে দিলেন। এতে মৃতসাগর সৃষ্টি হয়। সাদুমবাসীর আজাবের নির্দর্শন এখনও বিদ্যমান।

হ্যরত শুয়াইব (আ)

হ্যরত শুয়াইব (আ) একজন বিখ্যাত নবি। তিনি ছিলেন হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার পুত্র মাদয়ানের বংশধর। হ্যরত লৃত (আ)-এর সাথেও তাঁর আতীয়তার সম্পর্ক ছিল। যে স্থানে তাঁরা বাস করতেন তাও মাদয়ান নামে অভিহিত। অতএব, মাদয়ান একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এটি ফিলিস্তিনের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মায়নার পূর্বে মহাসড়কে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে শাম, আরব ও মিশরে বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করত। এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর ও সমৃদ্ধশালী ছিল। বাসিন্দারা অত্যন্ত ধনী ছিল। মাদয়ান শহরটি আজও পূর্ব-জর্দানের সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ‘মায়ানের’ অদূরে বিদ্যমান আছে।

হ্যরত মূসা (আ) মিশর থেকে মাদয়ানে এসেছিলেন এবং হ্যরত শুয়াইব (আ)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মূসা (আ) শুয়াইব (আ)-এর কন্যা সফুরাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি শুয়াইব (আ)-এর আশ্রয়ে ১০ বছর ছিলেন। শুয়াইব (আ)কে তাঁর চমৎকার বক্তৃতার জন্য খতিবুল আন্দিয়া বলা হয়।

হ্যরত শুয়াইব (আ)-কে যে সম্পদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে আহলে মাদয়ান, আসহাবে মাদয়ান ও আসহাবে আইকা বলা হয়। এরা মূর্তিপূজা করত। নিজেরা নবির কথা মানত না। যারা মানত তাদের বাধা দিত ও নির্যাতন করত। পথিকদের ধনসম্পদ লুটে নিত। মাপে-ওজনে কম দিত।

মাদয়ানবাসীদের বিকট শব্দ, অগ্নিবৃষ্টি ও ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এরপর শুয়াইব (আ) হায়রামাওত যান এবং সেখানেই ইন্তিকল করেন।

হ্যরত ইলিয়াস (আ)

হ্যরত ইলিয়াস (আ) ছিলেন মুসা (আ)-এর ভাই হারুন (আ)-এর বংশধর। তিনি জর্দানের ‘আলআদ’ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার ইসরাইলের শাসনকর্তা ছিলেন আখিব অথবা আখিয়াব। তিনি হ্যরত হিয়কীল (আ)-এর পরে এবং আল ইয়াসা (আ)-এর পূর্বে বনি ইসরাইলের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি হ্যরত হিয়কীল (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শামের বাসিন্দাদের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচারের কেন্দ্র ছিল শামের শহর ‘বালাবাক্সু’।

ঐ সময় ইসরাইলিরা আল্লাহকে ভুলে যায়। তারা এক আল্লাহর ইবাদত না করে নানারকম শিরকে লিপ্ত হয়। তারা মূর্তি ও তারকাপূজা করত। তাদের প্রধান মূর্তি ছিল বা‘ল দেবতা। নবির কথায় বাদশাহ ইমান এনেছিল। কিন্তু তার স্ত্রীর প্ররোচনায় আবার শিরকে লিপ্ত হয়।

আল্লাহর আজাবে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। ও বছর ধরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিল। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা নবির কাছে এসে আবেদন-নিবেদন করায় তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। কিন্তু বিপদ কেটে যাওয়ার পর আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মুশরিক হয়ে যায়। তাদের উপর আজাবের জন্য তারা নবিকেই দোষারোপ করে। তারা তাঁর প্রতি ঘোরতর শত্রুতা শুরু করে। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন। তাদের উপর আবার আল্লাহর আজাব আসে।

হ্যরত যুলকিফল (আ)

হ্যরত যুলকিফল (আ) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার একজন প্রিয় বাস্তু। যুলকিফল অর্থ প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী। দায়িত্ব পালনকারী। তিনি হ্যরত আইয়ুব (আ)-এর পুত্র ছিলেন বলে উল্লেখ আছে। নবি হ্যরত ইয়াসা (আ) খুব বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাইলেন, যিনি তাঁর পক্ষ থেকে নবির কর্তব্য পালন করতে পারেন। নবি তার অনুসারীদের একত্রিত করে বললেন, যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে তাঁকেই আমি প্রতিনিধি নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি হলো:

১. সর্বদা দিনে রোয়া রাখা,
২. সারা রাত ইবাদত করা,
৩. কোনো সময় রাগ না করা।

এক ব্যক্তি উঠে বললেন, এ তিনটি গুণ আমার মধ্যে আছে। নবি প্রথম দিনের সমাবেশ শেষ করলেন। পরবর্তী দিনে আবার সমাবেশ হলো। নবি পূর্ববর্তী শর্ত আবার উল্লেখ করলেন। এবারও ঐ ব্যক্তি উঠে আগের মতো বললেন। নবি তাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। হ্যরত যুলকিফল সারাজীবন শর্ত পূরণ করে চললেন।

ইবালিস শয়তান তাঁকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এক ময়লুম বৃদ্ধের বেশে পর পর তিন দিন তাঁর ধৈর্যচূড়ির চেষ্টা করল। তাঁকে রাগাতে চাইল। কিন্তু পারল না। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরবর্তীতে নবি করেছিলেন।

হ্যরত যাকারিয়া (আ)

হজরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন বনি ইসরাইলের একজন নবি। তিনি ছিলেন হজরত সুলাইমান (আ)-এর বংশধর। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হ্যরত হারুন (আ)-এর বংশধর।

হ্যরত ঈসা (আ)-এর মাতা মরিয়মের অভিভাবক ছিলেন হ্যরত যাকারিয়া (আ)। তিনি ইবাদতখানার ইমাম ও মোতোয়াল্লী ছিলেন। তাঁর বৎশে হ্যরত ইমরান ও তাঁর স্ত্রী হান্না ছিলেন আল্লাহভক্ত। হান্না ছিলেন মরিয়মের মাতা।

হয়েরত যাকারিয়ার কোনো সন্তান ছিল না। বৃদ্ধ অবস্থায় সন্তানের আশাও ছিল না। মরিয়মের কাছে অমৌসুমি ফল দেখে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হয়। তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলেন যার নাম হবে ইয়াহিয়া।

তাঁর সম্প্রদায় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। ইমান আনল না। তারা নবির সাথে শত্রুতা শুরু করল। তাঁকে হত্যা করার ঘড়্যন্ত্র করতে লাগল। তিনি একটি গাছের কেটেরে আশ্রয় নিলেন। ইহুদিরা তাঁকে গাছসহ দ্বিখণ্ডিত করল। তিনি উহু শব্দটিও করলেন না। সবুর করলেন। আমরা তাঁর জীবন থেকে ধৈর্যের শিক্ষা গ্রহণ করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা দশজন নবি-রাসূলের নাম খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্নাও।

১) আমাদের সূফি করেছেন কে?

ক. মানুষ

খ. রাসূল

গ. আল্লাহ

ঘ. জিন

২) মহানবির (স) আমার নাম কী?

ক. মরিয়ম

খ. আমিনা

গ. আছিয়া

ঘ. ফাতিমা

৩) হারবুল ফিজর শব্দের অর্থ কী?

ক. অন্যায় সমর

খ. ন্যায় সমর

গ. শান্তি

ঘ. শৃঙ্খলা

৪) হিলফুল ফুজুল কত বছর স্থায়ী ছিল?

ক. ২০ বছর

খ. ৩০ বছর

গ. ৪০ বছর

ঘ. ৫০ বছর

৫) সূরা আলাকের কয়টি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল?

ক. ৩টি

খ. ৪টি

গ. ৫টি

ঘ. ৬টি

৬) মহানবি (স) কতো বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন?

ক. ৪০ বছর

খ. ৪৫ বছর

গ. ৫০ বছর

ঘ. ৫৫ বছর

৭) হ্যরত মুসা (আ)-এর পিতার নাম কী?

ক. ইউসুফ

খ. ইমরান

গ. ইদরীস

ঘ. ইউনুস

৮) হ্যরত মুসা (আ) কোন বৎশে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. বনি ইসরাইল

খ. কিবতী

গ. বনি বকর

ঘ. বনি হাসেম

৯) ফিরআউনের স্ত্রীর নাম কী?

ক. আম্বিয়া

খ. হাজেরা

গ. আচ্ছিয়া

ঘ. আমিনা

১০) মিশর ছেড়ে হ্যরত মুসা (আ) কোথায় গিয়েছিলেন?

ক. ইরাকে

খ. ইরানে

গ. সিরিয়া

ঘ. মাদায়ানে

১১) হ্যরত হৃদকে (আ) কোন জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল?

- ক. আদ
- গ. কুরাইশ

- খ. সামুদ
- ঘ. কিবতী

১২) হ্যরত সালিহ (আ)-কে কোন জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল?

- ক. সামুদ
- গ. সাউদ

- খ. সেলজুক
- ঘ. আদ

১৩) হ্যরত ইসহাক (আ)-এর পিতার নাম কী?

- ক. হ্যরত নূহ (আ)
- গ. হ্যরত ইররাহীম (আ)

- খ. হ্যরত ইদরীস (আ)
- ঘ. হ্যরত সুলায়মান (আ)

১৪) হ্যরত ইলিয়াস (আ) কোন নবির স্থলাভিষিক্ত হন?

- ক. হ্যরত হারুন (আ)
- গ. হ্যরত হিয়াকিল (আ)

- খ. হ্যরত মুসা (আ)
- ঘ. হ্যরত লৃত (আ)

১৫) হজরত যুলকিফল কার পুত্র ছিলেন?

- ক. হ্যরত ইউনুস (আ)
- গ. হ্যরত ইসমাইল (আ)

- খ. হ্যরত আইয়ুব (আ)
- ঘ. হ্যরত লৃত (আ)

১৬) হ্যরত যাকারিয়া (আ)- এর পুত্রের নাম কী।

- ক. হারুন
- গ. ইয়াহিয়া

- খ. ইউসুফ
- ঘ. ইমরান।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কুরআন মজিদে জন নবি-রাসুলের নাম উল্লেখ আছে?
২. মহানবি (স)-এর নাম আবু তালিব।
৩. মহানবি (স)-এর উপর অটল বিশ্বাস ছিল।
৪. হিলফুল ফুজুল শব্দের অর্থ সংঘ।
৫. প্রথম তিন বছর জন নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেন।

গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. মহানবি (স) এর আম্মা আমিনা ইন্তিকাল করেন মহানবি (স) এর	১৫ বছর বয়সে
খ. মহানবি (স) হিলফুল ফুজুল গঠন করেন	৬৩ বছর বয়সে
গ. মুহাম্মদ(স) নবুয়ত লাভ করেন	৬ বছর বয়সে
	৪০ বছর বয়সে

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন :

১. মহানবি (স) কতো খ্রিস্টাব্দে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
২. মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কী ?
৩. পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবি (আ)-এর নাম লেখ ।
৪. হিলফুল ফুজুল কী ?
৫. মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে কী বলেছেন ?
৬. প্রাচীনকালে মিশরের বাদশাহকে কী বলা হতো ?
৭. মুসা (আ) কার ঘরে এবং অর্থব্যয়ে লালিত পালিত হয়েছিলেন ?
৮. তিনজন নবি (আ)-এর নাম লেখ ।
৯. নারীদের মধ্যে এবং পুরুষদের মধ্যে কে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন ?

বর্ণনামূলক উত্তরের জন্য প্রশ্ন :

১. মহানবি (স)-এর আম্মা ইন্তিকালের পর তাকে কে লালন-পালন করেন?
২. মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্রের ৫টি সুন্দর আদর্শ লেখ । সামাজিক জীবনে উক্ত
আদর্শগুলোর গুরুত্ব কী?

৩. শিশু মুহাম্মদ (স) কীভাবে অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন? বর্ণনা কর।
৪. জুয়াখেলার খারাপ দিকগুলো বর্ণনা কর। জুয়াখেলা বন্ধের জন্য তুমি কীভাবে জনমত সৃষ্টি করবে মতামত দাও।
৫. মহানবি (স) নিজ হাতে কী কী কাজ করতেন? নিজ নিজ পরিবারে নিজ হাতে করতে পারা যায় এমন ৫টি কাজের তালিকা তৈরি কর।
৬. দয়া মহানবি (স)-এর একটি উজ্জ্বল আদর্শ— উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৭. মাতৃতত্ত্বের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৮. মহানবি (স) চাকর ও শ্রমিকদের সম্পর্কে কী বলেছেন তার বর্ণনা দাও।
৯. ফিরআউন কী? ওলীদ স্বপ্নে কী দেখে? বর্ণনা কর।
১০. ফিরআউন কীভাবে মারা যায় তার বর্ণনা দাও।
১১. আদ জাতি কোথায় বসবাস করত? তাদের ধর্মসের কারণ লেখ।
১২. লৃত বা মৃত সাগর কোথায়? বর্ণনা কর।

হামদে ইলাহী

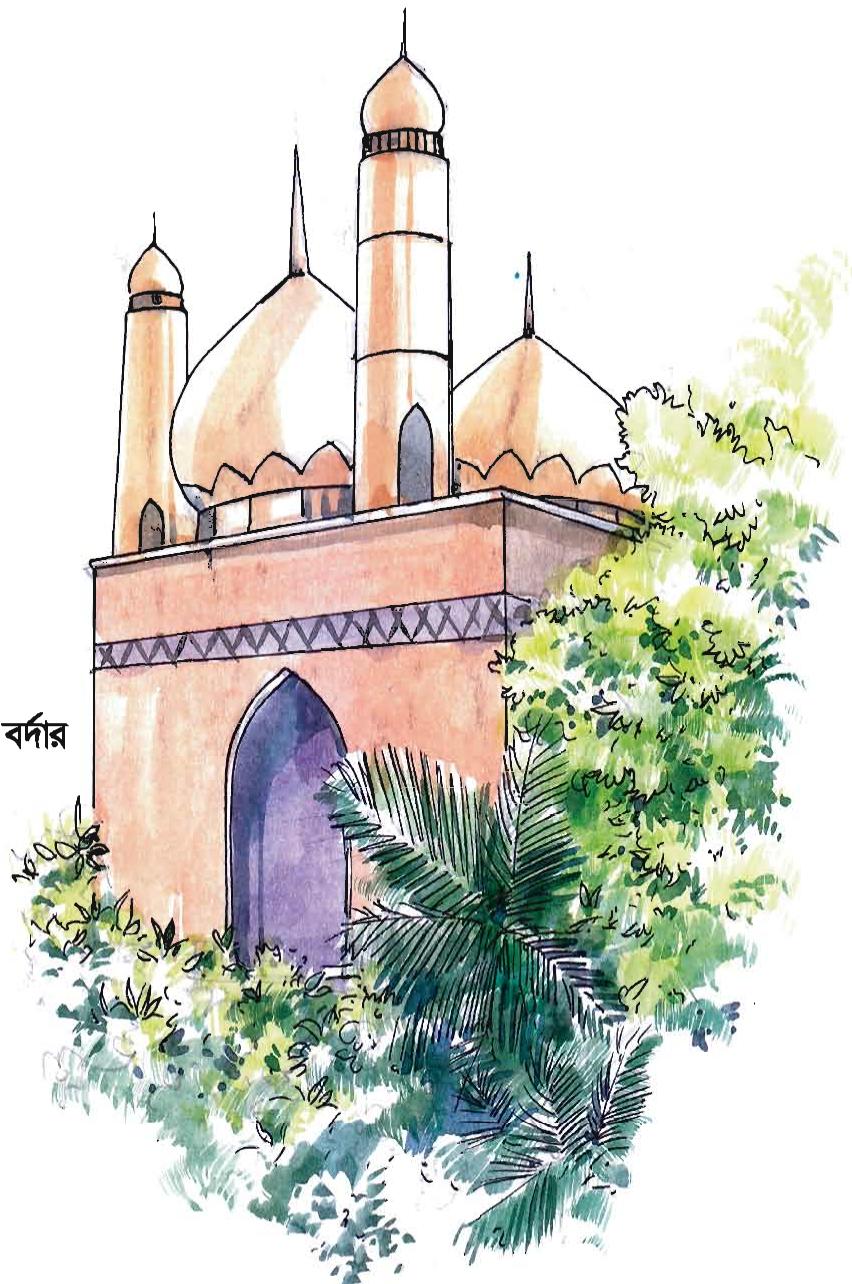
কাজী নজরুল ইসলাম

শোন শোন ইয়া ইলাহী
 আমার মোনাজাত ।
 তোমারি নাম জপে যেন
 হৃদয় দিবস রাত ।

যেন কানে শুনি সদা
 তোমারি কালাম হে খোদা,
 চোখে যেন দেখি শুধু
 কুরআনের আয়াত ।

দুখে যেন জপি আমি
 কলমা তোমার দিবস—যামী,
 (তোমার) মসজিদেরই ঝাড়ু বর্দার
 হোক আমার এ হাত ।

সুখে তুমি দুখে তুমি,
 চোখে তুমি বুকে তুমি,
 এই পিয়াসী প্রাণের, খোদা
 তুমি আব হায়াত ।



নাতে রাসুল (স)

ফররুখ আহমদ

ওগো— নূর নবী হয়রত

আমরা— তোমারি উম্মত।

তুমি দয়াল নবী,

তুমি নূরের রবি,

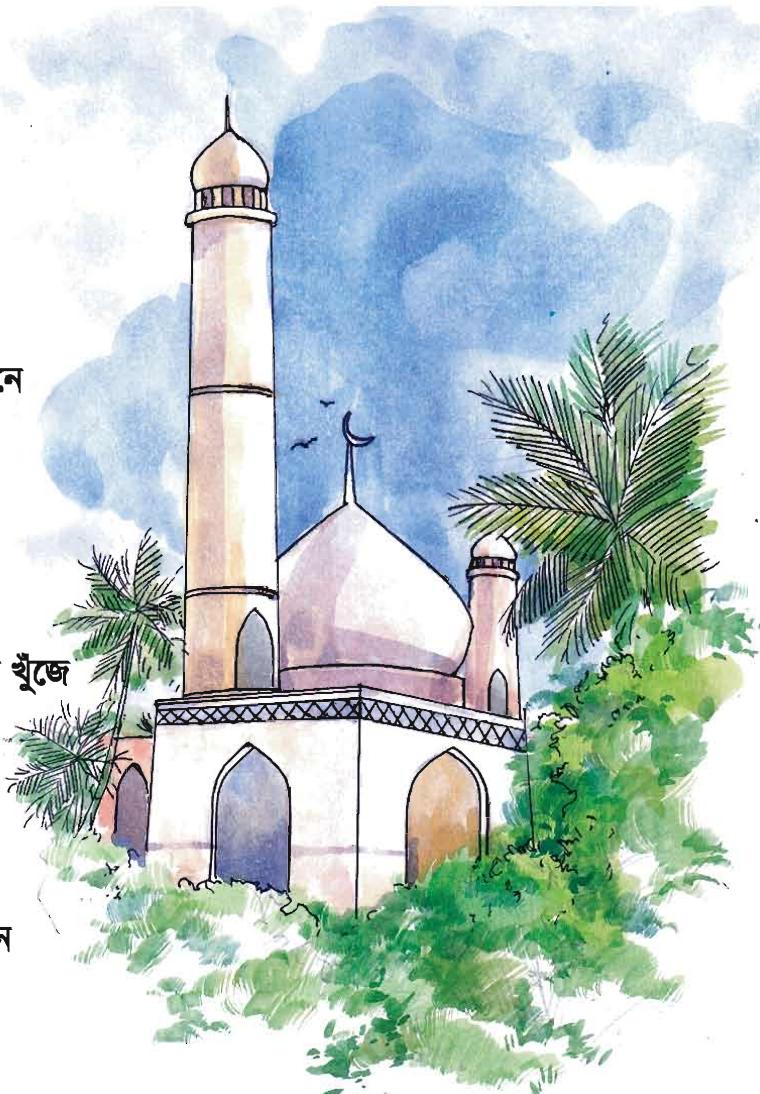
তুমি— বাসলে ভালো জগত জনে
দেখিয়ে দিলে পথ।

আমরা— তোমার পথে চলি

আমরা— তোমার কথা বলি
তোমার আলোয় পাই যে খুঁজে
ঈমান ইঙ্গিত।

সারা জাহানবাসী

আমরা— তোমায় ভালোবাসি,
তোমায় ভালোবেসে মনে
পাই মোরা হিম্মত।



পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হামদে ইলাহী ও নাতে রাসুল সুর করে শ্রেণিতে পরিবেশন করবে।

২০২২ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪৬- ইসলাম



তোমরা সৎকর্মে অতিযোগিতা কর

-আল কুরআন



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য